বৌদ্ধরমণী

ডাক্তার শ্রীবিমলা চরণ লাহা,

এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি।

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভাণ্ডার প্রেস।
২১৬নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয়

পিতা ও পিতামহের

উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল

—গ্রন্থকার

সূচীপত্র

দু'টো কথা

"বৌদ্ধযুগে রমণী" আজ মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইল। এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। পুস্তকখানিকে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিবার চেষ্টার ক্রটী করি নাই। ইহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গল্প ও আখ্যায়িকা আছে। এ পুস্তকে প্রাচীন ভারতের সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি কেমন ছিল তাহা বেশ জানিতে পারা যায়। তখনকার রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক সরস চিত্রগুলিও বেশ তৃপ্তিপ্রদ। মৌলিক প্রমাণ ও পুস্তকাবলীর উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। আশা করি এ বিষয়ে যাঁহারা গবেষণা করিতে চান এ পুস্তকখানি তাঁহাদের পথ-প্রদর্শকের কাজ করিবে।

পরম পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, ডি-লিট, সি-আই-ই মহোদয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইতি—

৪৩নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
৮ই জুলাই, ১৯২৯।

শ্রীবিমলা চরণ লাহা

ভূমিকা

শ্রীমান্ বিমলা চরণ লাহা, পি-এইচ্. ডি, এম এ, বি এল, ১৯২৭ সালে বৌদ্ধ সাহিত্যে স্ত্রীলোকের স্থান নামে ইংরাজিতে একখানি বই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন বইখানির বেশ সুখ্যাতি হইয়াছিল। বইখানির শেষে ইংরাজী অকারাদিক্রমে একখানি সূচি দেওয়ায় বইখানি পড়িবার বেশ সুবিধা হইয়াছে। তিনি এখন সেই বইখানি বাঙ্‌লায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমি বাঙলা ও ইংরাজী দুই-ই আগাগোড়া পড়িয়াছি।

বাঙ্‌লা বই হইতে দেশের লোক জানিতে পারিবে বৌদ্ধেরা স্ত্রীলোকদের কিরূপ সম্মান করিত; কিরূপ লেখাপড়া শিখাইত, সমাজে, বিশেষ সঙ্ঘে, তাহাদের কিরূপ স্থান দিত, তাহাদের স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল, বৌদ্ধ হইয়া তাহারা কিরূপে ধর্ম্ম-উপদেশ দিত। এই সকল কথা বিমল বাবুর বইএ সব খুলিয়া লেখা আছে। বিমল বাবুর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে যে, তিনি নিজে কিছু বলেন না। যাহা কিছু বলেন তাহা পালি বই হইতে তুলিয়া দেন এবং কোন্ বইএর কোন্ অধ্যায় হইতে তুলিলেন সেইটি লিখিয়া দেন; সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকে না।

এই বইএ বৌদ্ধদের বিবাহ সম্বন্ধে একটি বড় অধ্যায় আছে। তাহাতে কিরূপ শুভক্ষণে বিবাহ হইত, বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রীর কি সম্বন্ধ ছিল, এ সকল কথা আছে। ভাই-ভগ্নী, খুড়তুত ও মাস্‌তুত

ভাই-ভগ্নী, এ সকলের বিবাহ সেকালে চলিত ছিল। যে বংশে বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন সেই বংশেই ভগ্নী বিবাহের প্রথা ছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই বাপ মা বর পছন্দ করিয়া দিতেন। মেয়ে একটু বড় হইয়া গেলে সে স্বয়ম্বর করিত। স্বয়ম্বর করিলে সে যাহাকেই পছন্দ করিত তাহার সহিত তাহাকে বিবাহ দিতে হইত। কিন্তু দুই এক জায়গায় ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। মেয়ে পছন্দ করিলেও বাবা বিবাহ দিলেন না। গন্ধর্ব্ব বিবাহ সেকালে ছিল। বাবাকে কিছু না বলিয়া যুবক-যুবতী বিবাহ করিয়া বসিল, শেষে সমাজ সে বিবাহ মঞ্জুর করিয়া লইল। বৌদ্ধদের ভিতর রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দুই এক স্থলে এ কথাও শুনা যায় যে, পুরুষ স্ত্রী চুরি করিয়া লইয়া গিয়া স্বামী-স্ত্রী-ভাবে বাস করিতে লাগিল। বিবাহের কোন কার্য্যই হইল না। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বড় কম।

সেকালে ক্রীতদাসী রাখার প্রথা ছিল। কিন্তু সেই দাসীরা ভাল কর্ম্ম করিলে তাহাদের মুক্তি দেবারও প্রথা ছিল। এরূপ মুক্তিদানের কয়েকটি উদাহরণ এই বইএ পাওয়া যায়। একটি দিয়া দিতেছি। উদয়নের মহিষী শামাবতী দাসীকে রোজ ফুল কিনিতে দিতেন। সে অর্দ্ধেক দামে ফুল আনিয়া বাকী অর্দ্ধেক চুরি করিত; কিন্তু একদিন বুদ্ধদেব চুরি দোষ দেখাইয়া উপদেশ দিতেছিলেন; সেই উপদেশ শুনিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল। সেই দিন সে পুরা দাম দিয়া অনেক ফুল লইয়া গেল। রাণী

জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তুমি এত ফুল আনিলে কি করিয়া ?" সে বলিল, "এতদিন আমি চুরি করিয়াছি। বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনিয়া আমি চুরী ত্যাগ করিয়াছি। তাই আজ পুরা দাম দিয়া পুরা ফুল আনিয়াছি।" রাণী তাহাকে বকিলেন না, বরং বুদ্ধদেব কি উপদেশ দিয়াছেন তাহাই বলিতে বলিলেন। বুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছেন সে সব আগাগোড়া বলিল। সে বলিলে রাণী খুব খুসী হইলেন। সেই অবধি রাণী তাহাকে মায়ের মত দেখিতে লাগিলেন এবং উপদেশ শুনিতে লাগিলেন এবং বলিলেন তুমি প্রত্যহ বুদ্ধের কাছে যাইয়া তিনি যে উপদেশ দিবেন আমাকে বলিও। রোজ এইরূপ বলিতে বলিতে সমস্ত 'ত্রিপিটক' তাহার অভ্যাস হইল।

সব সন্ন্যাসীরাই স্ত্রীলোকের উপর চটা। স্ত্রীলোক যে পাপে ভরা একথা সব দেশের সব সন্ন্যাসী সব সময়ে বলিয়াছেন। যোগ, ধ্যান, ধর্ম্ম এ সবই স্ত্রীলোকের জন্য নষ্ট হয়। বুদ্ধদেবও স্ত্রীলোকদিগকে ভালচক্ষে দেখিতেন না। কিন্তু তাঁহার মাসী মহাপ্রজাপতী অনেকবার জিদ করায় তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন; কিন্তু বলিয়াছিলেন আমার ধর্ম্ম যদি এক হাজার বৎসর থাকিত এই কাজের দরুণ পাঁচশত বৎসরের বেশী থাকিবে না। অনেক স্ত্রীলোক কিন্তু নিজগুণে বৌদ্ধসঙ্ঘে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে অর্হৎ হইয়াছিলেন। বিমল বাবু একটী দীর্ঘ অধ্যায়ে এই সকল স্ত্রীলোকের জীবনচরিত দিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনচরিত পড়িলে বাঙালীর মেয়েদের অনেক উপকার হইতে পারে।

এই বইখানি লিখিয়া বিমল বাবু বাঙলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিলেন এমন নহে, বাঙালী মেয়েদের যাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞান হয় তাহারও যথেষ্ট সহায়তা করিলেন। আশীর্ব্বাদ করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ বই লিখিয়া দেশের উপকার সাধন করুন।

২৬নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
২২শে চৈত্র ১৩৩৫।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বৌদ্ধরমণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধযুগে উদ্বাহ-তত্ত্ব

বালিকাদিগের বিবাহের বয়স

ভারতবর্ষের অন্যান্য সময়ের ইতিহাসের মত বৌদ্ধযুগেও নারীদের জীবনের বেশীর ভাগই বিবাহ এবং স্বামিসম্পর্কীয় ব্যাপারের সঙ্গেই সংযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। বালিকাদের বিবাহের বয়সের কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম আমাদের চোখে পড়ে নাই। বাল্য-বিবাহ যে প্রচলিত ছিল তাহারও কোনও উদাহরণ পাওয়া যায় না। তবে ১৬ বৎসর বয়সে কোনও কোনও বালিকার যে বিবাহ দেওয়া হইত, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অসিলক্‌খণ-জাতকে (সং ১২৬) দেখা যায়, কোনও রাজকুমারীকে ১৬ বৎসর বয়সে বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। রাজগৃহের জনৈক শ্রেষ্ঠি-কন্যা সুন্দরী কুণ্ডলকেসী ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিল; এ কথার উল্লেখ ধম্মপদের অথ্‌কথাতে (২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭) আছে। এখানে এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, এই বয়সে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গলাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আচার-ব্যবহারে বিবাহ-সম্পর্কে যে সব বিধি-নিষেধ দেখা যায় বৌদ্ধসাহিত্যে তাহাদের

কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না; বরং তাহাতে ভগিনী-বিবাহের পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। প্রমাণ-স্বরূপ খুদ্দক-পাঠের পরমত্থ-দীপনীতে লিচ্ছবীদের উদ্ভব সম্বন্ধে যে পৌরাণিক কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা যায় (এইচ, স্মিথের সং, পৃঃ ১৫৮-১৬০)

ভ্রাতা ও ভগিনীতে বিবাহ

সুমঙ্গল-বিলাসিনীতে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮—২৬০) এইরূপ আরও একটি বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র তাহা অনুমোদন করে না। রাজা ওক্কাকের পাঁচটি রাণী ছিলেন। প্রধানা মহিষীর গর্ভে তাঁহার চারিটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই প্রধানা মহিষীর মৃত্যুর পর রাজা অন্য একটি যুবতীকে বিবাহ করেন; এই রমণী রাজাকে দিয়া শপথ করাইয়া লন—যে তাঁহার পুত্রকেই সিংহাসনে বসিবার অধিকার দান করিতে হইবে। রাজা অতঃপর পুত্রদিগকে রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে রাজকুমারেরা ভগিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের কাছে অরণ্যের ভিতর নগর প্রতিষ্ঠার উপযোগী স্থানের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এই অন্বেষণের সময়েই কপিল ঋষির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। এই ঋষি যেখানে বাস করিতেন, সেখানে রাজপুত্রদিগকে নগর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উপদেশ দেন। রাজপুত্রেরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানেই নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নামকরণ করেন—কপিলবত্থু (কপিলবস্তু)। সময়ে এই রাজপুত্রেরা

কপিলবস্তু প্রতিষ্ঠা

চারি জনে চারি ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কেবল জ্যেষ্ঠ ভগিনীটীই কাহাকেও বিবাহ করে নাই। পরে ইহারাই শাক্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাবংসেও ভগিনীবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। লাঢ় রাজ্যের রাজা সীহবাহু তাহার ভগিনী সীহসীবলীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালের অবস্থা

বৌদ্ধ-কাহিনীতে ভগিনী-বিবাহের দ্বারা কয়েকটি বিখ্যাত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু ঐ সমস্ত গল্পের ভিতর ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু আছে তাহা বলা কঠিন। প্রাচীন ভারতের যত দিনের ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে ভগিনী-বিবাহ প্রচলিত ছিল এরূপ কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ঋগ্‌বেদের যম এবং যমীর গল্পটাও এই কথাই প্রমাণ করে। ঋগ্‌বেদের সময় হইতে তাহার পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত এরূপ বিবাহ ভারতবাসী অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছে।

অন্যান্য ভগিনী-বিবাহ

পক্ষান্তরে সহোদরা ভিন্ন অন্যান্য ভগিনীর সহিত বিবাহের দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। রাজকুমারী বজিরার সহিত তাঁহার পিতৃস্বসারপুত্র রাজা অজাতসত্তুর (অজাতশত্রুর) বিবাহ হইয়াছিল। মঘ নামক মগধের জনৈক গৃহস্থ তাহার মাতুলকন্যা সুজাতাকে বিবাহ করে (ধম্মপদত্থকথা ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭১)। আনন্দ তাঁহার পিতৃস্বসার কন্যা উপ্পলবণ্ণার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন (ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯)। এই

ঘটনাগুলি হইতেই বোঝা যায় যে, সহোদরা ভিন্ন অন্য ভগিনীকে বিবাহ করিবার বাধা ছিল না। জাতকের নিম্নলিখিত গল্পটিও এই পদ্ধতির সমর্থন করে (জাতক সং ১৬২ ও ১২৬):—কোন রাজার এক কন্যা ও ভাগিনেয় ছিল। তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিত। রাজা এ বিবাহ অনুমোদন না করিয়া ভাগিনেয়কে অন্য এক দেশের রাজকুমারীর সঙ্গে এবং নিজের কন্যাকে অন্য এক দেশের রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কন্যাকে কড়া পাহারার ভিতর রাখিবার ব্যবস্থা হইল। এক রাত্রিতে নিজেই কন্যার উপর দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার সম্মুখে একটি ছোট শয্যাতে কন্যার শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কন্যা শয়ন করিল বটে, কিন্তু নিদ্রা গেল না; কিছুক্ষণ পরে উঠিয়াই পিতাকে কহিল,—"বাবা আমি স্নান করিব।" পিতা কহিলেন—"বেশ আমার সঙ্গে আইস।" রাজা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া জানালার ধারে গমন করিলেন এবং বাহিরে একটি পদ্ম-পত্রের উপর তাহাকে স্নান করিবার জন্য নামাইয়া দিয়া তাহার হাত ধরিয়া রহিলেন। স্নান করিতে করিতে রাজকুমারী এক খানি হাত রাজার ভাগিনেয়, তাহার প্রেমাস্পদের দিকে বাড়াইয়া দিল। অতঃপর রাজকন্যার হাত হইতে বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার গুলি খুলিয়া লইয়া একটি পেলব-হস্ত বালকভৃত্যের হাতে সেগুলি পরাইয়া রাজকুমার সেই বালক ভৃত্যটিকে রাজকুমারীর কাছে পদ্মাসনের উপর বসাইয়া দিলেন। রাজকুমারী বালক ভৃত্যের হাতটি পিতার

হাতে সমর্পণ করিয়া রাজকুমারের সহিত পলায়ন করিল। রাজা বালক ভৃত্যটিকেই রাজকুমারী মনে করিয়া স্নানাবসানে তাহাকে রাজকীয় শয়নাগারে নিদ্রার জন্য পাঠাইয়া দিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন এবং রুদ্ধদ্বারে নিজের মোহর আঁটিয়া দিলেন। রাজা বিশ্রামের জন্য স্বীয় ঘরে যাইবার পূর্ব্বে দ্বারে ইহার উপরে আবার কড়া পাহারা বসাইয়া দিলেন। কিন্তু পরের দিন দ্বার খুলিতেই দেখিলেন রাজকন্যা নাই —তাহার পরিবর্ত্তে একটি বালক ভৃত্য রহিয়াছে। এই বালক ভৃত্যটিকে প্রশ্ন করিয়া রাজকুমার ও রাজ-কুমারী যে উপায়ে পলায়ন করিয়াছেন রাজা তাহা অবগত হইলেন। সব শুনিয়া রাজার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল! তিনি ভাবিলেন, "সঙ্গে সঙ্গে যদি থাকা যায়, এমন কি যদি হাতও ধরিয়া রাখা যায় তথাপি রমণীকে আগলাইয়া রাখা যায় না।" ইহার পর রাজা তাঁহার ভাগিনেয়ের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং মাতুলের মৃত্যুর পর এই রাজকুমারই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

মহাবংসে সহোদরা ভিন্ন অন্য ভগিনীর সহিত বিবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (মহাবংস, গাইগরের সংস্করণ, পৃঃ ৫৮) লঙ্কার রাজা পাণ্ডু-বাসুদেবের কন্যা চিত্তা অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য এরূপ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিলেই না কি লোকে উন্মত্ত হইয়া যাইত। এই জন্য তাঁহার নাম হয় উন্মাদচিত্তা'। কোন জ্যোতিষী তাঁহার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলেন যে, চিত্তার পুত্র

তাঁহার ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিবে। পাছে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় এই আশঙ্কায় রাজকুমারেরা তাঁহাদের এই একমাত্র ভগিনীকে কেবলমাত্র এক-স্তম্ভ-বিশিষ্ট ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই ঘরটিতে প্রবেশ করিতে হইলে রাজার শয়নাগারের ভিতর দিয়াই প্রবেশ করিতে হইত। চিত্তার সেবার জন্যও একটির বেশী দাসী ছিল না। এক দিন হঠাৎ চিত্তার মাতুলপুত্র দীঘগামনি তাহার নয়নপথে পতিত হইল এবং এই প্রথম দর্শনেই সে এই যুবকটিকে তাহার চিত্ত বিকাইয়া দিল।—ইহার পর দাসীর সাহায্যে গামনি প্রত্যহ রাত্রিতে গোপনে রাজকুমারীর গৃহে গমন করিত। কিছু দিনের মধ্যেই রাজকুমারী গর্ভবতী হইলেন। অতঃপর দাসী রাণীকে এই গর্ভসঞ্চারের কথা জানাইলে তিনি কন্যার নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া রাজাকে জানান। রাজা তাঁহার পুত্রদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া চিত্তাকে তাহার এই মাতুল-পুত্রের সঙ্গেই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন (মহাবংস, গাইগরের সংস্করণ, ৯ম অধ্যায়)।

সুবণ্ণপালী তাহার পিতৃস্বসারপুত্র পুণ্ডকাভয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারাই রাণীর পদে অভিষিক্তা হইয়াছিলেন (মহাবংস, ১০ম অধ্যায়, ৭৮ শ্লোক)।

বিবাহ প্রথা

তিন রকমের বিবাহ প্রচলিত ছিল—(১) উভয় পক্ষের অভিভাবক দ্বারা স্থিরীকৃত বিবাহ, (২) স্বয়ংবর বিবাহ এবং (৩) গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

সাধারণতঃ উভয় পক্ষের অভিভাবকেরাই বিবাহ স্থির করিতেন। এরূপ বিবাহ সমানবর্ণ ও সমমর্য্যাদার দুই পরিবারের ভিতরেই সংঘটিত হইত। এ বিবাহ হিন্দুদের ভিতর প্রচলিত প্রাজাপত্য বিবাহেরই অনুরূপ। অর্থের নহে -বর্ণের সমতাই এ বিবাহের প্রধান ও প্রথম বিবেচ্য বিষয় ছিল। প্রামণ স্বরূপ শ্রাবস্তীর কোষাধ্যক্ষ মিগারের উল্লেখ করা যায়। সাকেতের কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় যখন মিগারের পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যা বিসাখার বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন মিগার সে প্রস্তাবে সম্মত হইবার পূর্ব্বে কুলশীলের সমতাটাই বিশেষভাবে যাচাই করিয়া লইয়াছিলেন। (Buddhist Parables পৃঃ ১৯১, ধম্মপদত্থকথা ১ম খঃ, পৃঃ ৩৯০) বব্বুজাতকে (সং ১৩৭) দেখা যায় কাণা নাম্নী শ্রাবস্তীর কোনও বালিকার অন্য গ্রামের সমশ্রেণীর কোনও যুবকের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। নক্খত্ত-জাতকে (সং ৪৯) আছে, শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানের জনৈক ভদ্রলোক শ্রাবস্তী নগরে তাঁহার সমশ্রেণীর একটি বালিকাকে তাঁহার পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন ধার্ম্মিক ও ধনী বণিকের কন্যা ইসিদাসী তাঁহার সমপদস্থ আর এক জন বণিক্পুত্রের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল (থেরীগাথা টীকা, পৃঃ ২৬০)। সৌরাষ্ট্ররাজ পিঙ্গলের প্রধান সেনাপতি নন্দকের কন্যা উত্তরা সমপদস্থ কোনও একটি যুবককে বিবাহ করেন।

শ্রাবস্তীর কোন উপাসকের কন্যা অন্য একটি সমপদস্থ পরিবারের একটি লোকের সহিত বিবাহবন্ধনে

আবদ্ধ হইয়াছিল (বিমানবত্থু ভাষ্য, পৃঃ ১২৮)। রাজগৃহের কোষাধ্যক্ষ্যবংশসম্ভূতা সিগালকমাতার বিবাহ সমপদস্থ আর একটি পরিবারে সম্পন্ন হইযাছিল (মনোরথপূরণী, পৃঃ ২২৭)।

উপরে উল্লিখিত সাধারণ পদ্ধতির এই বিবাহ-গুলিতে বিবাহের জন্য বরের কন্যাগৃহে গমনের প্রথা ছিল। বর এবং বরযাত্রিগণ কন্যাপক্ষের দ্বারা বিশেষ সমাদরে গৃহীত হইতেন। তাঁহাদিগের বাসস্থান, অন্যান্য আনুসঙ্গিক বস্তু, মাল্য, পোষাক প্রভৃতিও সরবরাহ করা হইত।

অবদানকল্পলতায় বিরূঢ়কাবদানে, থেরীগাথায়, মহাবংসে এবং জাতক প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় যে, বিবাহে জাতি বা বংশমর্য্যাদার বিচার করা হয় নাই। কোশলের রাজা পসেনদি শাক্য মহানামের দাসীকন্যাকে বিবাহ করিয়া মহাসমারোহে শ্রাবস্তীতে লইয়া গিয়া-ছিলেন। এই বালিকাটির নাম ছিল মল্লিকা এবং সে অপূর্ব্ব স্পর্শের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

জাতি ও বংশমর্য্যাদা

পসেনদি বিবাহের দ্বারা বুদ্ধ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায় শাক্য-কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে তিনি শাক্যদের দ্বারা প্রতারিত হন। তাহারা শাক্যপ্রধান মহানামের দাসী-কন্যা বাসভ-খত্তিয়াকে তাঁহার কাছে প্রেরণ করে। পসেনদি এবং বাসভখত্তিয়ার পুত্র বিরূঢ়ভ এই প্রতারণার প্রতি-শোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোক কোনও বণিকের দেবী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কালে এই

পত্নীর গর্ভে অশোকের মহিন্দ নামে একটি পুত্র এবং সঙ্ঘমিত্তা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে (মহাবংস, পৃঃ ১০১)। দরিদ্র গৃহের কন্যা কিসাগোতমীর যখন ধনী বণিকের পুত্রের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তখন সে বিবাহে জাতি বা পদমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই (ধম্মপদত্থকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭০)। ছাদের উপর হইতে একটি তস্করকে দেখিয়া কুণ্ডলকেসী প্রথম দৃষ্টিতেই যখন প্রেমে পড়ে, তখন এই তস্করের সহিত তাহার পরিণয়ের ব্যবস্থা করায় কুণ্ডলকেসীর পিতা-মাতাকে কুল, শীল, অর্থমর্য্যাদা ও পদগৌরব বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল (ঐ, পৃঃ ২১৭)। বঙ্কহার প্রদেশের শিকারীদের রাজার কন্যা চাপাকে উপক নামে এক জন সাধুর সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। উপক এই শিকারীটির গৃহের নিকটেই বাস করিত এবং ভিক্ষার জন্য তাঁহার গৃহেও গমন করিত। একদা শিকারী শিকা-রোদ্দেশে এক সপ্তাহের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া দূরদেশে গমন করেন। যাইবার সময় চাপাকে বলিয়া যান—সাধু আসিলে তাহার সেবার যেন ক্রটি না হয়। সুতরাং প্রথম দিন সাধু ভিক্ষার জন্য আসিলে চাপা নিজেই বাহিরে আসিয়া তাহাকে ভিক্ষা দান করিল। চাপার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সাধু আর মন স্থির রাখিতে পারিল না। গৃহে ফিরিয়া কামতাড়নায় সে সাত দিন অনশনে কাটাইয়া দিল। শিকারী ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত অবগত হইল। ইহার পর চাপার সহিত উপকের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (থেরীগাথা ভাষ্য, পৃঃ ২২০)। যে অবস্থায় শিকারীর কন্যার সহিত সাধুর পরিণয়

সংঘটিত হইয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ-ব্যাপারে জাতি ও পদমর্য্যাদা যে উপেক্ষিত হইত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই যে চাপার পিতা তাঁহার কন্যাকে উপকের সহিত বিবাহে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ হইবে না। দিব্যাবদানে (পৃঃ ৬২০) চণ্ডাল সর্দ্দার ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান হইতে দেখা যায় যে, চণ্ডালসর্দ্দারের শিক্ষিত পুত্র শার্দ্দূলকর্ণের সহিত এক ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের সহিত চণ্ডালের বিবাহের আর কোনও দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই।

দ্বিতীয় রকমের বিবাহ স্বয়ংবর নামে অভিহিত হয়। এই বিবাহে সমবেত পাণিপ্রার্থীদের ভিতর হইতে বাছিয়া কন্যা মনোমত বর গ্রহণ করেন। কুণাল-জাতকে (৫৩৬ সং) দেখা যায়, রাজকুমারী কন্যা স্বয়ংবর সভার পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র অর্জ্জুন, নকুল, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির এবং সহদেবকে দেখিয়া পাঁচ জনকে এক সঙ্গে ভালবাসিয়া ফেলেন এবং তাঁহাদের কয়েক জনের মস্তকেই পুষ্পমাল্য নিক্ষেপ করিয়া বলেন—"মা, আমি এই পাঁচ জনকেই মনোনীত করিলাম।" অতঃপর এই পাঁচ জনকেই তিনি স্বামিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। এ উপাখ্যান যে মহাভারতে বর্ণিত দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ব্যাপারেরই অনুসরণ মাত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। নচ্চজাতকে (৩২ সং) নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন রাজকুমারী তাহার পিতার নিকট এই বর

স্বয়ংবর-বিবাহ

প্রার্থনা করে যে, তাহাকে যেন তাহার নিজের মনোমত স্বামী পছন্দ করিয়া লইতে দেওয়া হয়। তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করিয়া নৃপতি-মণ্ডলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সমস্ত দেশ হইতে নৃপতিরা আসিয়া সভায় সমবেত হইলে, রাজা তাঁহার কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"এই বার এই নৃপতিমণ্ডলের ভিতর হইতে তুমি তোমার মনোমত পতি বাছিয়া লও।" রাজকুমারীর মনো-নয়নও হইয়া গেল। কিন্তু এই মনোনীত পাত্রটির ভিতর ভদ্রতা এবং সৌজন্যের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় রাজা তাহার সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না।

হিন্দু-সাহিত্যে সাধারণতঃ দেখা যায় যে স্বয়ংবর-সভায় কন্যার নির্ব্বাচনই চরম। মনোনীত পাত্রের কোন দোষ থাকিলেও এই মনোনয়নের পর আর পাত্রের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। অবশ্য স্বয়ংবর-সভায় রাজা এবং রাজপুত্রেরাই কেবল পাণিপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতেন। কেবলমাত্র উপরে উল্লিখিত ঘটনাতেই দেখা যায় যে, শেষ মনোনয়নের ভার পিতা নিজের হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধম্মপদত্থকথায় আর একটি স্বয়ংবর-বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। অসুররাজ বেপচিত্তি তাঁহার কন্যাকে যে কোনও অসুরের সহিত বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি মনস্থ করেন যে তাঁহার কন্যাকে তাহার নিজের মনোমত স্বামী বাছিয়া লইবার সুযোগ দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি অসুরকে সমবেত করিয়া

তাঁহার কন্যার হস্তে পুষ্পমাল্য প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎসে, এই সমবেত অসুরমণ্ডলীর ভিতর হইতে তুমি তোমার মনোনীত স্বামী বাছিয়া লও।" কন্যা এক জনকে বাছিয়া তাহার গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়াছিল। (ধম্মপদত্থকথা ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৪-২৭৯)।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ

তৃতীয় রকমের বিবাহের নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এ বিবাহে অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে পাত্র এবং পাত্রী পরস্পর পরস্পরকে বাছিয়া লয় এবং বিবাহে কোনও রূপ রীতিনীতি বা অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয় না।

কট্‌ঠহারি-জাতকে (সং ৭) গান্ধর্ব্ব বিবাহের একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। একদা এক রাজা তাঁহার প্রমোদ উদ্যানে গিয়া সেখানে চারিদিকে ফুল এবং ফলের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় একটি রমণী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। স্ত্রীলোকটি কুঞ্জের ভিতর কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে আনন্দিত মনে গান করিতেছিল। প্রথম দৃষ্টিতেই রাজা তাহার সহিত প্রেমে পতিত হইলেন এবং অচিরে হৃদ্যতা স্থাপিত হইল। কিছু দিন পরেই রমণীটি রাজাকে জানাইল যে, সে গর্ভবতী হইয়াছে। রাজা তাহাকে স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দান করিয়া কহিলেন,—"যদি তোমার কন্যা হয়, তবে এই অঙ্গুরী তাহার ভরণ-পোষণের নিমিত্ত ব্যয় করিও। কিন্তু যদি পুত্র হয়, তবে এই অঙ্গুরীসহ তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।" যথাসময়ে রমণী একটি পুত্র প্রসব করিল।

পুত্রটি যখন ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে এবং খেলা করিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইল, তখন মাতা অঙ্গুরীসহ পুত্রকে লইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। বহুকষ্টে বালকটি যে রাজপুত্র তাহা প্রমাণিত হয়। অতঃপর রাজা তাহাকে রাজ-প্রতিনিধি এবং তাহার মাতাকে পাটরাণীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই কাহিনীটি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলন-কাহিনীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

বলপূর্ব্বক হরণ

স্ত্রীলোককে কখনও কখনও প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া কখনও বা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। অপহৃতা রমণীগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে বিবাহিতা না হইয়াও পত্নীরূপেই বাস করিত। ধম্মপদত্থকথায় (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১) দেখা যায়, উজ্জয়িনীর চণ্ডপজ্জোত (চন্দ্রপ্রদ্যোত) তাঁহার কন্যা বাসুলদত্তাকে উদেনের নিকট হস্তী ধরিবার মন্ত্র শিখিবার জন্য প্রেরণ করেন। উদেন এই বাসুলদত্তার প্রেমে পতিত হন এবং তাহাকে লইয়া পলায়ন করেন। পরে উদেন বাসুলদত্তাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার মহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ধম্মপদত্থকথায় (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬০) নিম্নলিখিত গল্পটিরও উল্লেখ আছে :—"পটাচারা শ্রাবস্তীর কোন ধনী মহাজনের কন্যা। যখন তাহার বয়স ১৬ বৎসর তখন তাহাকে একটি সাত তলা অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ তলায় রাখা হয়। সতর্ক প্রহরীরা তাহাকে সর্ব্বদা পাহারা দিত। এই রমণীটি তাহার বালকভৃত্যের সহিত প্রেমে

পড়িয়া যায়। পিতা কিন্তু কুলে শীলে সমান অন্য যুবকের সহিত তাহার বিবাহ ঠিক করিয়াছিলেন। তাই বিবাহের দিন পটাচারা তাহার প্রেমাস্পদের সহিত গোপনে পলায়ন করে এবং বহুদূরে একটি গ্রামে গিয়া এক খানি কুটীরে উভয়ে বাস করিতে থাকে। এই কাহিনীটির কোথাও এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, তাহারা উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। তথাপি তাহারা যে স্বামিস্ত্রীর মতই বাস করিত তাহার প্রমাণ আছে। যথাসময়ে পটাচারা একটী সন্তান প্রসব করিয়াছিল (থেরীগাথাভাষ্য, পৃঃ ১০৮ তুলনীয়)। অশোক-জাতকেও (সং ১০০) দেখা যায় যে, কোশলের রাজা বৃহৎ বাহিনী লইয়া বারাণসীর রাজার বিরুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাঁহার রাণীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। পরে এই রাণীকেই তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তক্কজাতকে (সং ৬৩) রমণীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনার আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। এক জন দস্যুসর্দ্দার একটি গ্রাম্যবালিকাকে হরণ করিয়া আনিয়া স্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

ছল বা বলের দ্বারা অপহরণ অথবা প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে মিলন বন্ধ করিবার জন্য স্ত্রীলোককে সর্ব্বদা পর্দ্দার অন্তরালে রাখা হইত। ধম্মপদত্থকথা (২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭) হইতে জানা যায় যে, বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইলে অবস্থাপন্ন পিতামাতা কন্যাকে সাত তলা প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ তলায় রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন। এক জন দাসী তাহাদিগকে পাহারা দিত। কোনও পুরুষ

ভৃত্য সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। বড়ঘরের মেয়েরা সাধারণতঃ গৃহের বাহিরে গমন করিতেন না। কোথাও গমন করিতে হইলে তাঁহারা রথ বা ঐ রকমের অন্য কোনও যানে যাতায়াত করিতেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা সাধারণ শকট ব্যবহার করিত অথবা মাথার উপর ছত্র বা তালপত্র ধারণ করিত। যে সমস্ত স্থানে এ সব কিছু পাওয়া যাইত না সেখানে পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল কাঁধে ফেলিয়া যাওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল (ধম্মপদত্থকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯১)। উপরের উদাহরণগুলি আলোচনা করিলে মনে হয় যে, অন্যান্য কারণের মধ্যে নারীহরণ ও সতীত্ব রক্ষার জন্যই এই দুইটী কারণেই মেয়েদের মধ্যে পর্দ্দা মানিয়া চলিবার পদ্ধতিটী গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই পর্দ্দা-নিয়মের কিন্তু ব্যতিক্রম হইতেও দেখা যায়। বিবাহের পর বিসাখা যখন শ্বশুরালয়ে গমন করিতে-ছিলেন, তখন অনাবৃত রথে চড়িয়া তিনি শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করেন।

পর্দ্দা প্রথা

সম্ভ্রান্ত-বংশের মহিলা কিন্তু সচরাচর কোথাও যাতায়াত করিতেন না, উৎসবের সময় তাহারাও অনুচর পরিবৃত হইয়া পদব্রজে নদীতে স্নান করিবার জন্য গমন করিতেন (ধম্মপদত্থকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০-১,৩৩৮)। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে পর্দ্দা প্রথা যে অলঙ্ঘনীয় ছিল না তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পদব্রজে নদীস্নানে গমন

বিবাহের জন্য শুভ দিন ধার্য্য করা হইত। এই শুভ দিনেই বর অথবা কনেকে গৃহে আনা অথবা বিবাহের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইত (দীঘনিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১)। বিবাহ ব্যাপারটাও শুভক্ষণে সম্পন্ন করিবার প্রথা ছিল। এ প্রথা অনেকেই বিশেষভাবে মানিয়া চলিতেন। নক্‌খত্ত-জাতকে (সং ৪৯) দেখা যায় যে, নক্ষত্র বিবাহ উৎসবের অনুকূল কি না এক জন সন্ন্যাসীর উপদেশ সে সম্বন্ধে গ্রহণ করা হইতেছে। তাঁহার নিকট হইতে নির্দ্ধারিত দিন বিবাহের উপযোগী নহে জানিয়া, বর বিবাহের জন্য কনের গৃহে যাওয়া সত্যসত্যই বন্ধ করিয়াছিলেন।

বিবাহের জন্য শুভ দিন নির্দ্ধারণ

বৌদ্ধ--সাহিত্যে বিবাহ--সম্পর্কে যৌতুক দিবার প্রথার বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ধম্মপদত্থ-কথার (১ম খণ্ডে) বিসাখাবত্থুতে কনের পিতার দ্বারা যৌতুক-দানের দৃষ্টান্ত আছে। বৌদ্ধ-সাহিত্যে বিসাখার নাম বিশেষ পরিচিত। এই বিসাখার বিবাহের সময় তাহার পিতা শ্রাবস্তীর কোষাধ্যক্ষ মিগার যৌতুকস্বরূপ কন্যাকে পাঁচশত শকট-পরিপূর্ণ অর্থ, পাঁচশত শকট-পরিপূর্ণ স্বর্ণ-পাত্র, পাঁচশত শকট-পরিপূর্ণ রৌপ্যপাত্র, পাঁচশত শকট-পরিপূর্ণ তাম্রপাত্র, পাঁচশত শকট-পরিপূর্ণ রেশম নির্ম্মিত নানারকমের পরিচ্ছদ, পাঁচশত শকট-পরিপূর্ণ ঘৃত, পাঁচশত শকট-পরিপূর্ণ ঝাড়াবাছা চাউল, পাঁচশত শকট-পরিপূর্ণ লাঙ্গল, লাঙ্গলের ফাল এবং চাষের উপযোগী অন্যান্য যন্ত্রপাতি

যৌতুক

দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ৬০ হাজার বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ, ৬০ হাজার গাভী এবং কতকগুলি বলিষ্ঠ এঁড়ে বাছুর দান করিয়াছিলেন।

ধম্মপদত্থকথা এবং জাতকে দেখা যায় যে, বিবাহের সময় পিতা কন্যাকে স্নানের জন্য অর্থ দান করিতেন। কোশলাধিপতি পসেনদির পিতা মহাকোসল তাঁহার কন্যা কোসল-দেবীকে মগধের রাজা বিম্বিসারের সহিত বিবাহ দেন। এই বিবাহে তিনি কন্যাকে স্নান ও গন্ধদ্রব্যেব যৌতুকস্বরূপ কাশীর এক খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন (জাতক সং ২৩৯ ও ২৮৩)। কোশলের রাজা পসেনদিব কন্যাব নাম ছিল বজিরা। মগধরাজ অজাতশত্তুর (অজাতশত্রুব) সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাকে স্নান ও গন্ধদ্রব্যের জন্য কাশীগ্রাম উপ-ঢৌকন স্বরূপ দান করা হইয়াছিল (ধম্মপদত্থকথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৬)। শ্রাবস্তীব কোষাধ্যক্ষ তাঁহার কন্যাব বিবাহের সময় এই বাবদে ৫৪ কোটী মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। (ধম্মপদত্থকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮)

বিবাহের উপঢৌকন

বিবাহের সময় উপঢৌকন আদায়ের প্রথা বিদ্যমান ছিল। ধম্মপদত্থকথায় (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮২) দেখা যায় মিগার শ্রেষ্ঠীব পুত্রের সহিত ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিসাখার বিবাহ উপলক্ষ্যেও এক শত গ্রাম হইতে এক শত রকমের উপঢৌকন সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

বিবাহিতা বালিকা-দিগের প্রতি উপদেশ

বিবাহের পর শ্বশুরগৃহে গমনের সময় বালিকাদিগকে নিম্নলিখিত উপদেশ দেওয়া হইত :— (ধম্মপদত্থকথা ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭-৩৯৮,)

(১) গৃহাভ্যন্তরের অগ্নি বাহিরে বহন করিও না।

(২) বাহিবের অগ্নি গৃহাভ্যন্তবে আনিও না।

(৩) যে দেয় তাহাকেই কেবল দান করিও।

(৪) যে দেয় না তাহাকে দান কবিও না।

(৫) যে দেয় এবং যে দেয় না ইহাদের উভয়কেই দান করিও।

(৬) সুখে উপবেশন কবিও;

(৭) সুখে ভোজন করিও।

(৮) সুখে নিদ্রা যাইও।

(৯) অগ্নির পরিচর্য্যা করিও।

(১০) গৃহদেবতাকে ভক্তি করিও।

উপরোক্ত দশটি উপদেশের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

উপদেশের ব্যাখ্যা

১। যদি শাশুড়ী বা পরিবারস্থ অন্য কোন মহিলা গোপনে গৃহাভ্যন্তরে কোনও কথার আলোচনা করেন, সে আলোচনা দাস বা দাসীর কাছে ব্যক্ত করিও না; কারণ তবে এইরূপ আলোচনা লইয়া জল্পনা-কল্পনা হয় এবং উহা হইতে অবশেষে গৃহবিবাদের হেতুও উপস্থিত হয়।

(২) দাস বা দাসীরা যে সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করে তাহা পরিবারস্থ কোনও লোকের কাছে ব্যক্ত করিবে না; কারণ এই সব আলোচনা লইয়া নানারূপ কথা বার্ত্তা হয় এবং অবশেষে বিবাদের সৃষ্টি করে।

(৩) কেবল তাহাদিগকেই ধার দিবে, যাহারা ধার লইয়া পরিশোধ করে।

(৪) তাহাদিগকে দান করিবে না যাহারা ধার লইয়া পরিশোধ করে না।

(৫) দরিদ্র আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব যখন সাহায্যপ্রার্থী হয়, তখন তাহাদের পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আছে কি না সে বিষয়ে চিন্তা না করিয়াই তাহাদিগকে সাহায্য করা উচিত।

(৬) শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেখিয়া বধূ বসিয়া থাকিবে না উঠিয়া দাঁড়াইবে।

(৭) শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীর পূর্ব্বে স্ত্রী কখনও আহার করিবে না। সে প্রথমে তাঁহাদিগকে ভোজ্য-দ্রব্য পরিবেষণ করিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে নিশ্চিন্ত হইবে যে তাঁহারা ভোজনে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজে আহারে উপবেশন করিবে না।

(৮) শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীর পূর্ব্বে স্ত্রী শয়ন করিবে না। প্রথমে তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবে, তাহার পর নিদ্রা যাইবে।

(৯) শ্বশুর-শাশুড়ী এবং স্বামীকে অগ্নিশিখা বা সর্পরাজের মত শ্রদ্ধা করিবে।

(১০) কোনও শ্রমণ যখন দূরদেশ হইতে কোনও গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইবেন তখন যেন তাঁহাকে বিমুখ করা না হয়। তাঁহাকে দেখিয়া গৃহ-স্বামিনীকে শক্ত এবং কোমল এই উভয় রকমের আহার্য্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন (ধম্মপদত্থকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩-৪০৪)।

নারীর বহু স্বামী গ্রহণের একটিমাত্র দৃষ্টান্তই বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাওয়া যায়। কুণালজাতকে (৫৩৬ সং)

এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ আছে। স্বয়ংবর সভায় রাজকুমারী কণ্হা পাঁচ জন স্বামী মনোনীত করিয়াছিলেন এবং একই সময়ে এই পাঁচজনের সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

বহু বিবাহ

নারীদের এক সময়ে একাধিক ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার নিয়ম ছিল না এবং সাধারণতঃ জীবনেও তাহারা দ্বিতীয়বার বিবাহিতা হইত না। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। নক্ষত্ত জাতকে (৪৫ সং) আছে যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে মনোনীত পাত্র না আসায় একটি পাত্রীকে অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পর প্রথম পাত্রটি আসিয়া যখন উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে এই উত্তর দেওয়া হয়, যে কোনও কন্যাকে দুই বার বিবাহ দেওয়া যায় না। স্বামী ভাল না বাসিলেও রমণীর অন্য পতি গ্রহণ বিধিবহির্ভূত ছিল। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যে, বিবাহিতা রমণীকে চুরি করিয়া বা প্রলোভনে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া স্ত্রীর মত করিয়া রাখা হইয়াছে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা একটির অধিক স্বামী গ্রহণ না করিলেও, পুরুষেরা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিত। বিমানবত্থু ভাষ্যে (পৃঃ ১৪৯-১৫৬) দেখিতে পাওয়া যায়, ভদ্দানাম্নী জনৈক বন্ধ্যা রমণী তাহার স্বামীকে তাহার ভগিনী সুভদ্দার পাণি-গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেছে। স্বামী অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

বব্বু জাতকে (সং ১৩৭) দেখা যায় যে, পত্নী পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে আসিতে বিলম্ব করায় স্বামী

বহুবিবাহের কারণ

দ্বিতীয়বার পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। রুহক-জাতকে (সং ১৯১) দুশ্চরিত্রা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের দৃষ্টান্ত আছে। অস্‌সক জাতকে (সং ২০৭) স্বামীর দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাশীরাজ্যের অন্তর্গত পোতলি নগরের রাজা অস্‌সক তাঁহার প্রথম মহিষী উব্বরীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। কোনও কোনও জাতকে (সং ৫১৪, ৫৩৮) দেখা যায় যে, কতকগুলি রাজার স্ত্রীর সংখ্যা ১৬ হাজার পর্য্যন্ত ছিল। মঘ নামে মগধের কোন গৃহস্থ চারিবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীদের নাম ছিল—নন্দা, চিত্তা, সুধম্মা এবং সুজাতা (ধম্মপদত্থকথা ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯)। রাজা বিম্বিসারের ৫০০ স্ত্রী ছিল (মহাবগ্‌গ ৮, ১, ১৫)। রাজা ওক্কাকের পাঁচটি রাণী ছিলেন (সুমঙ্গল-বিলাসিনী পৃঃ ২৫৮) মহাবংসে (পৃঃ ১৪) দেখা যায়, দুই বৈমাত্র ভগিনী মায়া এবং মহামায়ার শুদ্ধোধনের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। রক্‌হিল যে সমস্ত তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন সেগুলিতেও এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে। দেশের আইনে কোনও নাগরিকের পক্ষে দুই পত্নী বিবাহ করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু শুদ্ধোধন যুবরাজ থাকা কালে পার্ব্বত্য-জাতি পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে দুই পত্নী গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল; সুতরাং দেখা যায় যে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর জীবিতকালে বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর অন্য স্ত্রী গ্রহণে বাধা

ছিল না। আইনেও পুরুষকে একাধিক পত্নী গ্রহণে বাধা দেওয়া হয় নাই। পুরুষ এইরূপে একাধিক পত্নী গ্রহণের অধিকারী ছিল বটে, কিন্তু ইহাতে স্ত্রীলোকের দুর্ভাগ্যের সীমা ছিল না। সপত্নীরনিকট হইতে সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার লাভ করিত।

সপত্নী-সমস্যা।

সপত্নী থাকা স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ। সপত্নীরা প্রায়ই পরস্পরের সহিত বিবাদ করে। ফলে গৃহ শান্তি ও আনন্দেব স্থান না হইয়া অশান্তির আবাসভূমি হইয়া উঠে। তাহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া স্বামী অন্য রমণীব সহিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়—ইহা কোনও স্ত্রীই সহ্য করিতে পারে না (জাতক সং ৫১৯) স্বামীর বংশরক্ষার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বন্ধ্যা স্বামীকে দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতেছেন—কখনও কখনও এরূপ ঘটনাও ঘটিতে দেখা যায়। কিন্তু সপত্নী সন্তান প্রসব করিলে এবং স্বামীর প্রিয়পাত্রী হইলে এই সব স্ত্রীলোকের মনেও নারী-সুলভ হিংসার উদ্রেক হইতে দেখা গিয়াছে। ধম্মপদত্থকথায় (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫ হইতে) এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর এক জন গৃহস্থের প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা ছিল। সে স্বামীকে পুনরায় বিবাহ দিয়া দ্বিতীয় বধূ গৃহে লইয়া আসে। যথা-সময়ে এই বধূর গর্ভসঞ্চার হইল। ইহার পরেই প্রথমা স্ত্রীর মনে হিংসার উদয় হয় এবং সে ঔষধের সাহায্যে সপত্নীর গর্ভ নষ্ট করে। এইরূপ তিন বার তাহার গর্ভ নষ্ট হওয়ার পর ঔষধের দোষে মেয়েটিও অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু এই

দুশ্চরিত্রা রমণীটিও শাস্তির হাত হইতে মুক্তি পায় নাই। গর্ভবতী পত্নীর মৃত্যুর কারণ এবং বংশ লোপের হেতু বলিয়া স্বামী তাহাকে প্রহার করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। পেতবত্থুতে এই সম্পর্কে আর একটি ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীর জনৈক গৃহস্থের স্ত্রীর নাম ছিল মত্তা। সে নিঃসন্তান ছিল। সুতরাং সন্তান-কামনায় গৃহস্থ তিস্‌সা নাম্নী আর একটি রমণীর পাণিগ্রহণ করে। সপত্নীর প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণা হইয়া এক দিন মত্তা সমস্ত আবর্জ্জনা জড় করিয়া তিস্‌সার মাথায় নিক্ষেপ করিল। তিস্‌সা কিন্তু সপত্নীর সকল রকমের অপমান ও উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিত। মৃত্যুর পর মত্তা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং নানা প্রকারে দুঃখ ভোগ করে। অবশেষে মত্তা এক দিন তিস্‌সার নিকট আসিয়া তাহার নামে আট জন ভিক্ষুককে আহার্য্যদানের অনুরোধ জানায়। তাহার দুর্ব্ব্যবহারসত্বেও তিস্‌সার তাহার প্রতি কোনও রূপ বিদ্বেষ ছিল না। তাই সে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিল।

বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রথা তখন বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও আইন ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইসিদাসীর নামের উল্লেখ করা যায়। সে দুই বার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কারণ পরপর দুইটি স্বামীর এক জনেরও মনোমত না হওয়ায় উভয় স্বামীই তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন (থেরীগাথা পৃঃ ২৬০)। বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া দ্বিতীয় স্বামী

বিবাহ বন্ধন-চ্ছেদ

গ্রহণ এবং তাহার সঙ্গেও বিচ্ছিন্ন হইবার এরূপ দৃষ্টান্ত আর পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধযুগে স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহ যে একেবারে অজ্ঞাত বস্তু ছিল না তাহার পরিচয় কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। উচ্ছঙ্গ-জাতকের (সং ৬৭) ভূমিকায় দেখা যায় যে, একদা একটি রমণীর স্বামী পুত্র এবং ভ্রাতা কারাগারে আবদ্ধ ছিল। স্ত্রীলোকটির করুণ ক্রন্দনে রাজার চিত্ত দ্রবীভূত হয়। তিনি তাহাকে বলিলেন, "আমি তোমার এই আত্মীয় তিনটির ভিতর এক জনকে মুক্তি দিতে পারি! তুমি কাহার মুক্তি চাও?" স্ত্রীলোকটি কহিল, "মহারাজ আমি যদি বাঁচিয়া থাকি তবে অন্য স্বামী ও পুত্র লাভ করিতে পারিব। কিন্তু আমার পিতা মাতা যখন পরলোক গমন করিয়াছেন, তখন আর একটি ভ্রাতাকে লাভ করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব আমার ভ্রাতাকেই মুক্তিদান করুন।" এই উত্তর হইতে মনে হয় যে, স্ত্রীলোকেরও সম্ভবতঃ একাধিকবার বিবাহ করিবার অধিকার ছিল। ইসিদাসীর বৃত্তান্তটিও এই যুক্তিরই সমর্থন করে।

স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহ

মহাবংসে বিধবা-বিবাহের একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা খল্লাটাঙ্গ তাঁহার সেনাপতি কম্মহারত্তকের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বট্টগামণী এই সেনাপতিকে নিধন করিয়া রাজ্য শাসন করিতে

বিধবা-বিবাহ

এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া অনুলা দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, (গাইগের সং, মূল পৃঃ ২৬৯-২৭০)।

ক্ষেমেন্দ্রের অবদান-কল্পলতা হইতে জানিতে পারা যায় যে, নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধিকাবভুক্ত জিনিষ। পুরুষ যে ভাবে ইচ্ছা নারীকে বিলাইয়া দিতে পারে।

পত্নী দান

অরিষ্ট দেশের দানশীল রাজা শ্রীসেনের পত্নীর নাম ছিল জয়প্রভা। একদা তাঁহার গুরুব এক শিষ্য আসিয়া গুরুর দক্ষিণা স্বরূপ জয়প্রভাকে প্রর্থনা করিল। শ্রীসেন জয়প্রভাকে হাস্য-মুখে দান করিলেন। কিন্তু এই প্রার্থনানুযায়ী দক্ষিণা পাওয়াব পব গুরুদেবেব মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি রাজার বিশেষ প্রশংসা করিয়া রাণীকে প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন (শ্রীসেনাবদান)। মরীচির শিষ্য বাহীক মুনির অনুরোধে বৃদ্ধ ঋষির সেবার জন্য সাকেতের রাজা মনিচূড় তাঁহার পুত্র এবং রাণী পদ্মাবতীকে দান করিয়াছিলেন (মনিচূড়াবদান)। বিশ্বপুরীর যুবরাজ বিশ্বন্তরের কাছে ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আসিয়া তাঁহার পত্নী মাদ্রীকে যাচ্ঞা করেন। তিনি সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন (বিশ্বন্তরাবদন)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধযুগে ক্রীতদাসী

দাসী

বৌদ্ধযুগে বিবাহিতা পত্নী এবং অন্যান্য নারী ব্যতীতও পরিবারে আরও কতকগুলি রমণী থাকিত তাহারা দাসী নামে পরিচিত ছিল।

গৃহের অন্যান্য কাজ ছাড়াও দাসীকে ধান ভানিতে হইত (ধম্মপদত্থকথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২১), চাউল পিষিতে হইত (জাতক, সং ৪৫) এবং হাট বাজারে যাইতে হইত (ধম্মপদত্থকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৮)।

বিবাহ

দাসীর উপর প্রভুর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। তাই প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাহাদের বিবাহ হইতে পারিত না। কোশলরাজ পসেনদি যখন মহানামের দাসীকন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করেন, তখন তাঁহাকেও মহানামের অনুমতি লইতে হইয়াছিল।

স্বাধীনতা

যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিলে দাসী রমণীদিগকেও স্বাধীনতা দেওয়া হইত। থেরীগাথা-ভাষ্যে (পৃঃ ১৯৯) দেখা যায়, যে অনাথপিণ্ডিকের ক্রীতদাসীর কন্যা পুন্না এক জন ব্রাহ্মণকে তর্ক-বিচারে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মানুরাগী মনের পরিচয় দিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিল। থেরীগাথায় ভৃত্যের উপর প্রভুরই সম্পূর্ণ অধিকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রভু

তাহাদিগকে যতটুকু স্বাধীনতা দান করিতেন তাহা ছাড়া তাহাদের আর কোনও রকমের স্বাধীনতা ছিল না। (Psalms of the Brethren, p 36 ; cf Ibid, p 22).

দাসীরা নীচবংশে জন্মগ্রহণ করার নিমিত্ত সাধারণতঃ অশিক্ষিতা ও হীন স্বভাবের হইত। কেহ কেহ মুদ্রা এবং অন্যান্য দ্রব্য অপহরণ করিতেও দ্বিধা করিত না। কিন্তু তাহাদের উপব বৌদ্ধধর্ম্মেব প্রভাব উৎকৃষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ধম্মপদত্থকথায় নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। কোশম্বীর রাজা উদেনের মহিষী সামাবতীর খুজ্জুত্তরা নামে এক দাসী ছিল। সে প্রত্যহ রাণীর জন্য ফুল কিনিতে ৮ কহাপণ গ্রহণ করিয়া ৪ কহাপণের ফুল কিনিয়া আনিত। বাকি ৪ কহাপণ নিজে চুরি করিত। এক দিন ফুল কিনিবার জন্য সে মালাকারের গৃহে গমন করিয়া বুদ্ধের উপদেশ শুনিতে পাইল। এই রূপে

দাসী রমণীদের উপর বুদ্ধের প্রভাব

সে নির্ব্বাণের প্রথম সোপানে আরোহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিল। তাহার পর হইতে সে আর চুরি করিত না ; এবং রাণীর জন্য ৮ কহাপণের ফুল কিনিয়া লইয়া আসিত। রাণী এক দিন জিজ্ঞাসা করিলেন, ৮ কহাপণ দ্বারা আজকাল সে এত ফুল কি করিয়া সংগ্রহ করে। ক্রীতদাসীর কোনও কথা গোপন করিবার আর প্রবৃত্তি ছিল না ; কারণ তখন তাহার মনের ভিতর বুদ্ধের প্রতি বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সমস্ত কথাই সে অকপটে স্বীকার করিয়া

কহিল, বুদ্ধের উপদেশ হইতে সে বুঝিতে পারিয়াছে যে চুরি করা পাপ। যে ধর্ম্মকথা সে শুনিয়াছে, রাণী অতঃপর তাহাকে তাহাই বিবৃত করিতে কহিলেন। রাণী এবং তাঁহার পাঁচ শত সহচরীর সম্মুখে খুজ্জুত্তরা তাহা বিবৃত করিল। সমস্ত শুনিয়া দৈনিক ৪ কহাপণ চুরি করার জন্য কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া, বরং বুদ্ধের ধর্ম্ম শুনাইবার জন্য রাণী তাহাকে বিস্তর প্রশংসা করিলেন। ইহার পর হইতে সে রাণী এবং তাঁহার পাঁচ শত সহচরীর মাতা ও শিক্ষয়িত্রীর স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাঁহারা তাহাকে প্রতিদিন তথাগতের নিকট হইতে উপদেশ শুনিয়া আসিয়া তাঁহাদের কাছে তাহাই আবার বর্ণনা করিতে বলিতেন। সে ক্রমে ক্রমে ত্রিপিটক আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল (ধম্মপদত্থকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০০)।

মহাবংসে বীরণী দাসীর উল্লেখ আছে। অসোক ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রত্যহ আট জন ভিক্ষুর উপযুক্ত খাদ্য সঙ্ঘে যোগাইবার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। এ কাজ সে বিশেষ অনুরাগের সহিত সম্পন্ন করিত। ফলে মৃত্যুর পর বিমানে চড়িয়া সে স্বর্গে গমন করিয়াছিল (মহাবংস পৃঃ ২১৪)

বুদ্ধের এক জন গৃহী শিষ্য প্রত্যহ চারি জন ভিক্ষুর সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুদের পরিচর্য্যা করিবার ভার তিনি এক জন দাসীর উপর অর্পণ করেন। দাসীটি ষোল বৎসর ধরিয়া আন্তরিক সেবার দ্বারা এই ভিক্ষুদিগকে তুষ্ট করে, প্রকৃত ধর্ম্মের উপদেশগুলি পালন করে এবং ৩২ রকমের অপবিত্রতা

চিন্তা করিয়া পরিহার করে। ফলে মৃত্যুর পর সে ইন্দ্রের এক জন প্রিয়তম অনুচররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (বিমানবথু ভাষ্য পৃঃ ৯১-৯২)

কোশলের থূণ নামক ব্রাহ্মণ পল্লীর কোন ব্রাহ্মণের এক দাসী জল আনিতে গিয়া, বৃক্ষতলে উপবিষ্ট অবস্থায় বুদ্ধকে দেখিতে পায়। দাসত্ব জীবন হইতে মুক্তি লাভের এই সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া, ব্রাহ্মণের প্রহার এমন কি নিজেব মৃত্যুব ভয়কেও অগ্রাহ্য করিয়া, সে তাহার পাত্র হইতে বুদ্ধকে পান করিবার জন্য জল প্রদান করে। বুদ্ধের অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে পাত্রটি যতবার জলশূন্য হয় ততবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া শিষ্যদের সকলের তৃষ্ণা দূর করিয়াছিল। তথাগতের উপর দাসীর অনুরাগ বাড়াইবার জন্য তথাগত এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন; সুতরাং এক পাত্র জলের দ্বারা সমস্ত শিষ্যেব তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াও সে পূর্ণ ঘট লইয়াই গৃহে গমন করিয়াছিল। এই ঘটনা শুনিয়া কিন্তু ব্রাহ্মণ এত বেশী ক্রোধান্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নির্ম্মম প্রহারে দাসীটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (বিমানবথথু-ভাষ্য, পৃঃ ৪৫-৪৭)

এই ঘটনা হইতে সেকালে দাসীদের অবস্থা যে কিরূপ ছিল এবং প্রভুদের নিকট হইতে তাহারা কিরূপ ব্যবহার পাইত তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়।

দাসীদের অবস্থা বাস্তবিকই অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। রোমের ক্রীতদাসীর মত ভারতের ক্রীত-রমণীরাও প্রভুর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত, এবং

তাহাদের সম্বন্ধে প্রভুর যাহা খুসী তাহাই করিবার অধিকার ছিল। তাহাদের প্রতি প্রভুর এবং প্রভুপত্নীর ব্যবহার সময় সময় এত নির্ম্মম হইয়া পড়িত যে তাহা বর্ণনা করা যায় না। অধিকাংশ স্থলেই তাহারা দুর্ব্যবহার লাভ করিত। মজ্ঝিম-নিকায় গ্রন্থে গৃহকর্ত্রীর দুর্ব্যবহারের একটি অতি করুণ কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কালী নামে একটি রমণী শ্রাবস্তীর কোনও গৃহস্থের পত্নী বেদেহিকার দাসী ছিল। অত্যন্ত নিপুণতা এবং যোগ্যতার সহিত সে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিত। সে কখনও অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারিত না। গৃহস্বামিনীর যশ তাহারই কৃতিত্বের জন্য কি না, তাহাই নিরূপণ করিবার নিমিত্ত কালী এক দিন একটু বেলায় শয্যাত্যাগ করিল। গৃহস্বামিনী বিরক্ত হইলেন। দ্বিতীয় দিনেও শয্যাত্যাগ করিতে দেরী হইল। গৃহ-স্বামিনী সে দিন তাহাকে তিরস্কার করিলেন। তৃতীয় দিন সে আরও দেরী করিয়া শয্যাত্যাগ করিল। সে দিন গৃহস্বামিনী তাহাকে এরূপ ভাবে প্রহার করিয়াছিলেন যে তাহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল (মজ্ঝিম-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫ হইতে)।

বিমানবত্থু ভাষ্যে দাসীর প্রতি দুর্ব্যবহারের আর একটি করুণ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। গয়া গ্রামের কোনও ব্রাহ্মণকন্যা তাহার শ্বশুরগৃহে কর্ত্রী হন। একটি দাসীর কন্যাকে তিনি ঘৃণা করিতেন এবং কারণে ও অকারণে তাহাকে প্রহার করিতেন। ক্রমে সে বালিকাটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। তথাপি তাহার

লাথি ঘুষি প্রভৃতি প্রহারের দুঃখ ঘুচিল না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কস্‌সপ বুদ্ধের সময় এই দাসীটিই গৃহকর্ত্রী ছিল এবং ব্রাহ্মণ কন্যাটি দাসী ছিলেন। তখন সে তাহার দাসীব উপব অত্যন্ত অত্যাচার করায় এজন্মে অবস্থার এই পরিবর্ত্তন সজ্ঘটিত হইয়াছিল।

গৃহকর্ত্রী দাসীকন্যার চুল ধরিয়া প্রহাব কবিতেন বলিয়া সে এক দিন নাপিতের দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিল। অতঃপর রজ্জুর দ্বারা তাহার মস্তক বাঁধিয়া গৃহকর্ত্রী তাহাকে শাস্তি দান করিতেন। এই হেতু বালিকাটি রজ্জুমালা নাম লাভ করিয়াছিল। গৃহ-কর্ত্রীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যার জন্য সে বনে গমন করিল (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ২০৬—২০৯)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধযুগে নর্ত্তকী ও বারবণিতা

নৃত্য-গীত-কুশলা নর্ত্তকীর উল্লেখ জাতকে পাওয়া যায়। (জাতক ২ পৃঃ ৩২৪; ৫ পৃঃ ২৯৪) রাজার আমোদ-প্রমোদের জন্য তাহারা নিযুক্ত হইত এবং রাজ-অন্তঃপুরেই অবস্থান করিত। কোনও কোনও নৃপতির ষোল হাজার নর্ত্তকী ছিল। (Ibid, I, p. 437) চুল্ল-পলোভন জাতকে (Ibid, no. 263) নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ পাওয়া যায়—রাজপুত্র আমোদ-প্রমোদের প্রতি উদাসীন ছিলেন, রাজ্যের প্রতি তাঁহার স্পৃহা ছিল না এবং কখনও তিনি স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আসিতেন না; সুতরাং রাজপুত্রের এই উদাসীনতা দূর করিবার জন্য রাজা এক জন নর্ত্তকী নিযুক্ত করিলেন। নর্ত্তকীটি বয়সে তরুণী, নৃত্যগীতে সুদক্ষা। তাহার সংস্পর্শে আসিলে যে কোনও লোককে সে বশীভূত করিতে পারিত। এই রাজপুত্রকেও সে অমৃতের ন্যায় সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা প্রলুব্ধ করিল। তাহার চিত্ত-বিমোহন-কারী সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে রাজপুত্রের অন্তরে ধীরে ধীরে বাসনাসমূহ জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি সংসারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন এবং ভালবাসার আনন্দও তাঁহার অপরিজ্ঞাত রহিল না। অবশেষে এই নর্ত্তকীটির প্রেমে রাজপুত্র এমন ভাবেই ডুবিয়া গেলেন যে, তাহার কাছে অন্য কোন লোকের যাওয়া

তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এক দিন ছোরা হাতে রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়া পাগলের মত তিনি লোককে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার পর রাজা রাজপুত্রকে ধৃত করিয়া নর্ত্তকীটির সঙ্গে সহর হইতে নির্ব্বাসিত করেন। এই ঘটনাটি হইতে দেখা যায় যে, রাজপুত্র বিলাসের ভিতর বর্দ্ধিত হইয়াওনারীর ছলাকলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, নর্ত্তকীর মোহে পড়িয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল।

যৌবনের প্রারম্ভে গৌতমকেও এই ভাবে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। যুবরাজকে আমোদ-প্রমোদে অভ্যস্ত করিবার জন্য বহু নর্ত্তকী নিযুক্ত করা হয়। তাহারা নৃত্য-গীতে বিশেষ পারদর্শিনী ত ছিলই; দেখিতেও দেবকন্যাদের ন্যায় সুন্দরী ছিল। অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মণ্ডলাকারে গৌতমকে ঘিরিয়া তাহারা বাদ্যযন্ত্র বাজাইত, মহানন্দে নাচিত ও গান করিত। (Rhys Davids, Buddhist Birth Stories, p. 171.) দঘী নিকায়গ্রন্থে নাচের উল্লেখ পাওয়া যায়। (Dialogues of the Buddha, I. p.p. 5—7.) মহাবংস (পৃঃ ২২৭) এবং ধম্মপদত্থ কথায় (৩য় অধ্যায়, পৃঃ ১৬৬ এবং ২৯৭) নর্ত্তকীদের উল্লেখ আছে।

সাধারণ গৃহস্থের গৃহে যে সব রমণীর স্থান নাই, তাহাদের মধ্য হইতেই নর্ত্তকীদের উদ্ভব। পুরুষের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করাই তাহাদের কার্য্য ছিল। বারবণিতারূপে তাহারা

বারবণিতা—তাহাদের জীবন ও চরিত্র

তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিত। যদিও তাহারা রমণী, তথাপি জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাদিগকে এমন সব ঘৃণ্য কাজ করিতে হইত, যাহার ফলে তাহাদের নারী-সুলভ গুণসমূহ নষ্ট হইয়া যাইত। মনোমোহিনী আকৃতি, স্বব, গন্ধ, স্পর্শ এবং আলিঙ্গন প্রভৃতি ছলাকলার দ্বারা মানুষকে প্রলুব্ধ করিতেই তাহাবা অভ্যস্ত ছিল। তাহারা বেণীবদ্ধ দস্যুর মত, বিষাক্ত পানীয়ের মত, আত্ম-প্রশংসাপরায়ণ ব্যবসায়ীদেব মত, হরিণের বক্র শৃঙ্গের মত, বিষজিহ্ব সাপের মত, আচ্ছাদনযুক্ত গর্ত্তের মত, অপূরণীয় নরকের মত, যাহাকে সন্তুষ্ট করা যায় না সেইরূপ রাক্ষসীর মত, চির-ক্ষুধার্ত্ত যমের মত, সর্ব্বভুক্ অগ্নির মত, সর্ব্বগ্রাসী নদীর মত, যদৃচ্ছ বহমান বাতাসের মত, অপক্ষপাত মেরু পর্ব্বতের মত এবং চিরফলপ্রসূ বিষবৃক্ষের মত। (জাতক ৫ পৃঃ ৪২৫) যাহাকে তাহারা ভালবাসে তাহাকে যেমন আদরে গ্রহণ করে, যাহাকে ঘৃণা করে তাহাকেও ঠিক তেমনি আদরেই বরণ করে। (Cowell, Jataka. V. p 242). জ্বলন্ত অনলে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন ভস্মসাৎ হইয়া যায়, এই সব রমণী অর্থলালসা বা কামপ্রবৃত্তির প্রভাবে যে সব ধনী সন্তানকে আশ্রয় করে তাহারাও সেইরূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বলচিত্ত মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা তাহারা বিভিন্ন হাবভাব পরিগ্রহ করে এবং এইরূপে তাহা-দিগকে তাহাদের পাপের ফাঁদে জড়াইয়া লয়।

একবার ফাঁদে ফেলিতে পারিলে তাহারা নানা অসৎ উপায়ে তাহাদের অর্থ ও চরিত্র ধ্বংস করে। প্রতি রাত্রিতে প্রচুর অর্থ দিয়া যাহারা ইহাদিগকে পরিতৃপ্ত করে, এমনি অকৃতজ্ঞ ইহারা যে তাহাদিগকেও হত্যা করিতে দ্বিধা করে না (জাতক, ৪৫২ ৫ পৃঃ); কিন্তু নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি বার-বণিতার জীবনী হইতে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই তাহাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা আজীবন স্থায়ী হয় নাই। কোনও কোনও বারবণিতা বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রভাবে তাহাদেব জীবনের পাপপ্রবণ গতিটাকেও ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎ-পাটিত করিয়া সাংসারিক জীবন পরিহার করিয়া ইহারা আদর্শ-জীবনই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ইহারা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে পতিতা নারী রূপে তাহাদের যে জীবন আরম্ভ হয়, জীবনের শেষে তাহাই ঋষির ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। জন-সাধারণও তাহাদিগকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

অম্বপালী

বৈশালীর রাজোদ্যানে আম্রবৃক্ষের পাদমূলে অম্বপালীর জন্ম হয়। নগরের উদ্যান-পালক তাহার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। আম্রোদ্যান-পালকের কন্যা বলিয়া তাহার নাম হয় অম্বপালী। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত অঙ্গ অনিন্দ্যসুন্দর হইয়া উঠে—. কোথাও এতটুকুও খুঁত থাকে না। ইহার পর সে

সভা-নর্ত্তকী হয়। কারণ, বৈশালীতে এই আইন ছিল যে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী কখনও বিবাহ করিতে পারিবে না—জনসাধারণের আনন্দের জন্য তাহাকে উৎসর্গ করা হইবে। অম্বপালী সুন্দরী, মহিমময়ী, মনোহারিণী এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ণ সুষমার অধিকারিণী ছিল। নাচ, গান ও বীণাবাদনে তাহার তুলনা ছিল না। বহু পদমর্য্যাদাশীল গুণীলোক তাহার কাছে যাতায়ত করিতেন। এক রাত্রির জন্য তাহার দর্শনী ছিল ৫০ কহাপণ। (বিণয় পিটক, ২ অং, পৃঃ ১৭১); মগধের রাজা বিম্বিসার বৈশালীতে তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন এবং এক সপ্তাহকাল সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসে অম্বপালীর গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরে এই সন্তান অভয় নামে পরিচিত হইয়াছিল (অবদান কল্পলতায় আম্রপাল্যাবদান দ্রষ্টব্য)। এক দিন অম্বপালী জানিতে পারিল যে বুদ্ধ তাহার বৈশালীর বাগানে আগমন করিয়াছেন। সে বুদ্ধকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিল। বুদ্ধ তাহার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। বুদ্ধের বাণী শুনিয়া সে এতই আনন্দিত হইয়াছিল যে, সে বুদ্ধকে তাহার গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। ইহার পর লিচ্ছবিরা তাহাদের গৃহে বুদ্ধের আহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য অম্বপালীর অনুমতি প্রর্থনা করিয়াছিল। অম্বপালী কিন্তু তাহাদের প্রত্যাখান করে। এই বারবণিতার গৃহেই বুদ্ধ নানা উপচারে ভোজন করিয়াছিলেন। অতঃপর অম্বপালী বুদ্ধ ও তাঁহার

ভিক্ষু-সঙ্ঘকে “আরাম” দান করে এবং বুদ্ধদেব দান গ্রহণ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। বুদ্ধ এই আরামে দীর্ঘ দিন অবস্থান করিয়া বেলুব গ্রামে গমন করিয়াছিলেন: (দীর্ঘনিকায়, ২, পৃঃ ৯৫-.৮; বিণয় পিটক, ১, পৃঃ ২৩১-২৩৩); ইহার পর অম্বপালী তাহার পুত্রকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে দেখিয়া নিজেও দিব্যজ্ঞান অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করে। স্বীয় দেহের ক্রমধ্বংসশীল প্রকৃতি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের নশ্বরত্বও সে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশেষে সে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল। (Psalms of the Sisters, p. 125)

পদুমবতী

পদুমবতী উজ্জয়িনীর সভা-নর্ত্তকী ছিল। তাহার রূপের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া রাজা বিম্বিসার তাহার নিকট গমন করেন এবং এক রাত্রি তাহার সহিত অতিবাহিত করেন। পদুমবতী রাজাকে বলে যে, তাঁহার ঔরসে তাহার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে। রাজা তাহাকে বলেন, “তোমার যদি পুত্র সন্তান হয় তবে বড় হইলে তাহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিও।” এই বলিয়া তাহাকে একটি নিদর্শন দিয়া চলিয়া যান। যথাসময়ে এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল এবং এই পুত্রের নাম রাখা হইল অভয়। পুত্রটির বয়স যখন সাত বছর, তখন তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, সে রাজা বিম্বিসারের পুত্র। অতঃপর তাহাকে রাজার গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। রাজার স্নেহে রাজকুমারদের সহিত সে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

সময়ে এই পুত্রটি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অর্হত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুত্রের মুখ হইতে ধর্ম্মের বাণী শ্রবণ করিয়া এক দিন মাতাও সংসার পরিত্যাগ করেন। ধর্ম্মের বাহিরের আবরণ এবং ভিতরের অর্থ আত্মস্থ করিয়া অবশেষে পদুমবতীও অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল (থেরী গাথা-ভাষ্য পৃঃ ৩৯-৪০)।

বারবণিতা পদুমবতীর জীবন চরিত বৈশালীর বারা-ঙ্গনা অম্বপালীর জীবনেরই অনুরূপ। সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত সাদৃশ্য এই যে, একই লোকের অর্থাৎ রাজা বিম্বিসারেব ঔরসেই উভয় নর্ত্তকী, পুত্র সন্তান প্রসব করে এবং এই পুত্রদ্বয়ের নামও এক। উভয়ের নামই ছিল অভয়। তথাপি এই সাদৃশ্য হইতে উজ্জয়িনীর পদুমবতী এবং বৈশালীর অম্বপালীকে অভিন্ন বলিয়া মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

শালবতী

রাজগৃহে শালবতী নামে একটি সুদর্শনা, লাবণ্যময়ী মনোহারিণী এবং অসাধারণ সুন্দরী রমণী ছিল। রাজগৃহেরই এক বণিক এই শালবতীকে বারবণিতার ব্যবসায়ে দীক্ষিত করে। নাচ, গান এবং বংশীবাদনে তাহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। এক রাত্রির জন্য তাহার দর্শনী এক শত কহাপণ। কিছু দিনের ভিতরেই শালবতীর গর্ভসঞ্চার হইল। শালবতী জানিত যে গর্ভিণী বেশ্যাকে কেহই পছন্দ করে না। তাই এই গর্ভবস্থায় সে অসুখের ভাণ করিয়া কাহারও সহিত সাক্ষাৎ-করিত না। যথাসময়ে সে এক পুত্র প্রসব করিল এবং প্রসবের পরেই পুত্রটিকে আবর্জ্জনা-স্তূপের ভিতর নিক্ষেপ

করিল। প্রত্যুষে রাজার পরিচর্য্যার জন্য রাজকুমার অভয় যখন যাইতেছিলেন, তখন বায়স-পরিবৃত অবস্থায় তিনি এই শিশুটিকে দেখিতে পাইলেন। অনুচরেরা তাঁহাকে জানাইল যে শিশুটিকে কেহ সেইখানে পরিত্যাগ কবিয়াগিয়াছে এবং সে তখনও জীবিত আছে। ইহার পব যুবরাজের আদেশে শিশুটি প্রাসাদে নীত হয়। জীবিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহাকে জীবক নামে অভিহিত করা হইত। রাজকুমারের দ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া কেহ কেহ তাহার নাম দিয়াছিল কোমারভচ্চ। তাহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া জীবক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। (Vinaya Texts, II pp, 172-174).

সিরিমা বারবণিতা শালবতীর কন্যা (সুত্ত-নিপাত ভাষ্য ১ম খঃ পৃঃ ২৪৪) ও বিখ্যাত বৈদ্য জীবকের কনিষ্ঠা ভগিনী। সে অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না নর্ত্তকী ছিল এবং রাজগৃহে বাস করিত। কোষাধ্যক্ষ-পুত্র

সিরিমা

সুমনের স্ত্রী এবং কোষাধ্যক্ষ পুন্নকের কন্যা বুদ্ধের গৃহী-শিষ্যা উত্তরা প্রতি-রাত্রি সহস্র মুদ্রা দর্শনীতে তাহার স্বামীর পরিতৃপ্তির জন্য এই সিরিমাকে এক পক্ষ কালের জন্য নিযুক্ত করে (ধম্মপদত্থকথা, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩০৮ ৩০৯)। এক দিন সে অন্যায় করিয়া উত্তরার বিরাগভাজন হইয়া পড়িল এবং পুনরায় সদ্ভাব স্থাপনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও দ্বিধা করিল না। উত্তরা তাহাকে জানাইয়া দিল, যে, ভগবান বুদ্ধ যদি তাহাকে ক্ষমা করেন, তবে তাহার ক্ষমা করিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। ইহার পর এক দিন

ভগবান বুদ্ধ শিষ্য-সমভিব্যাহারে উত্তরার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান যখন তাঁহার আহার শেষ করিয়াছেন, সিরিমা তখনই তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বসিল। ভগবান ধন্যবাদ উচ্চারণ করিলেন এবং উপদেশ প্রদান করিলেন। সিরিমা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এই উপদেশ শ্রবণ করিল। ইহার পর সে পবিত্রতার প্রথম স্তরে উপস্থিত হয়। অতঃপর সে আট জন ভিক্ষুকে নিয়মিত ভাবে ভিক্ষা দিয়া আসিয়াছে (ধম্মপদত্থকথা, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১০৪) বিমানবত্থু-ভাষ্যে (পৃঃ ৭৫) দেখা যায় যে, এক জন ভিক্ষু তাহার দান গ্রহণ করার পরেই সে কাতর হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পর সে অপ্সরারূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া পাঁচ শত সহচরী সঙ্গে বুদ্ধের পূজার জন্য আগমন করিয়াছিল। সুত্তনিপাতভাষ্যে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৪) কিন্তু যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়, মৃত্যুর পর সিরিমা যামস্বর্গে সুযামের রাণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে যাহাই হোক, ধম্মপদত্থকথার বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সিরিমার মৃতদেহকে দাহ করা হয় নাই; কাকে ও কুকুরে যাহাতে ভক্ষণ করিতে না পারে সেজন্য এক জন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া শবাগারে তাহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাজা বিম্বিসার তাহার মৃত্যুর কথা ভগবান বুদ্ধকে জ্ঞাপন করেন। বুদ্ধই মৃতদেহটি দাহ না করিয়া রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অশুভভাবনার জন্য ভিক্ষুরা মৃতদেহটি প্রত্যহ দেখিতে পাইবে—ইহাই ছিল

তথাগতের এরূপ অনুরোধের উদ্দেশ্য। ইহাকে প্রত্যহ নিরীক্ষণ করিয়া ভিক্ষুরা এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল যে, যে দেহ অনিন্দ্যসুন্দর তাহাও ধ্বংস হয়, কীটের দ্বারা ভুক্ত হয় এবং অবশেষে মাংস-বর্জ্জিত হইয়া তাহার হাড়গুলিই কেবল পড়িয়া থাকে। নাগরিকদিগকেও সিরিমার এই মৃতদেহটি দেখিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। রাজা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, "এই মৃতদেহটি দেখিতে যে অস্বীকার করিবে তাহাকে আট খণ্ড মুদ্রা অর্থদণ্ড স্বরূপ দিতে হইবে।" নরদেহের সৌন্দর্য্য যে কত ক্ষণস্থায়ী তাহারই ধারণা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করাইবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল (ধম্মপদত্থকথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬-১০৯)।

সামা

সামা ছিল বারাণসীর বারবণিতা। তাহার এক রাত্রির দর্শনী ছিল সহস্র মুদ্রা। রাজার সে বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিল এবং তাহার পাঁচ শত দাসী ছিল। এক জন তরুণ-বয়স্ক বণিক্ তাহার প্রেমে পড়িয়া তাহাকে প্রতি রাত্রিতে সহস্র মুদ্রা দান করিত। অবশেষে তাহার জন্যই এই যুবকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক দিন সে তাহার গৃহের জানালার ধারে দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল যে, একটি দস্যুকে রাস্তা দিয়া ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। দস্যুটির সুন্দর, উজ্জ্বল, দেবতার ন্যায় দিব্য কান্তির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সামা তাহার সহিত প্রেমে পড়িয়া গেল। অতঃপর সামা শাসনকর্ত্তাকে জানাইল যে, দস্যুটি তাহার ভ্রাতা এবং তাহার গৃহ

ছাড়া তাহাব আর কোনও আশ্রয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে সহস্রটি মুদ্রাও পাঠাইয়া দিল। সামার অনুরোধে শাসনকর্ত্তা দস্যুটিকে মুক্তি দিলেন। ইহার পব সামা আর কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিত না এবং কেবল সেই দস্যুটির সঙ্গেই আমোদ-প্রমোদে সর্ব্বক্ষণ অতিবাহিত করিত। দস্যুটি কিন্তু মনে করিল সামা যদি আর কাহারও প্রেমে পতিত হয়, তবে সে হয়ত তাহাকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। তাই এক দিন সামাকে তাহার সমস্ত অলঙ্কার পরাইয়া দস্যুটি একটি উদ্যানে লইয়া আসিল এবং সেইখানে তাহাকে গলা টিপিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া দেহ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল। চেতনা পাওয়ার পর সামা তাহার প্রিয়তমেব আর কোনও সন্ধান পাইল না। ইহার পর কয়েক দিন সে অন্ন-জল পরিত্যাগ করিয়া অনশনে কাটাইয়া দিল। পরে যখন নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিল যে, সে আর ফিরিয়া আসিবে না, তখন সামা আবার তাহার পূর্ব্বের ঘৃণ্য জীবনযাত্রার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল। (Cowell, Jataka, III pp. 40-42).

সুলসা

বারাণসীতে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার নাম সুলসা। বারবণিতা সামার ন্যায় তাহারও পাঁচ শত সহচরী ছিল এবং এক রাত্রির জন্য তাহাকেও সহস্র মুদ্রা দিতে হইত। এক দিন জানালায় দাঁড়াইয়া সে যখন রাস্তার দিকে তাকাইয়া ছিল, তখন দেখিতে পাইল, একটি দস্যুকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া

হইতেছে। এই দস্যুটির নাম সত্তুক। তাহার হাত পশ্চাৎদ্দেশে নিবদ্ধ। প্রথম দৃষ্টিতেই সুলসা এই দস্যুটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল। সে মনে করিল—"এই বলিষ্ঠ-দেহ যুবকটিকে যদি সে মুক্ত করিতে পারে, তবে তাহাকে লইয়া সে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করিবে, আর পাপ জীবনের ছায়া মাড়াইবে না।" নগরের প্রধান কোতয়ালকে প্রচুর অর্থ উৎকোচস্বরূপ প্রদান করায় দস্যুটিকে মুক্ত করিয়া আনাও কঠিন হইল না। ইহার পর সুলসা আনন্দে ও পরম সুখে দস্যুর সহিত বাস কবিতে লাগিল। যে নারী বহুলোকের কাছে সময়ের অনুপাতে দেহ বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে, তাহার পক্ষে জীবনের ধারা এইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করা অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া কিন্তু বিচার করিলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ঘৃণ্য অবস্থাব ভিতর আছে বলিয়াই মানুষের মন তাহার জন্মগত স্বভাব হইতে বঞ্চিত হয় না। সুলসাও যে তাহার মনের মত মানুষের সঙ্গে সাধুভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল—নারীর জন্মগত সংস্কারই তাহার কারণ।. নারী-হৃদয়ের চিরন্তন পরিচয়ই তাহার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিন চার মাস পরেই দস্যুর মনে সুলসার হীরা জহরতের অলঙ্কারগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে এক দিন সুলসাকে কহিল—"আমি যখন রাজার-লোকদের দ্বারা বন্দী হই, তখন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া-

ছিলাম যে, মুক্তি পাইলেই পর্ব্বতের উপরিস্থিত একটি বৃক্ষ-দেবতার পূজা দিব।” সুলসা এই কথা শুনিবামাত্র তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সমস্ত অলঙ্কার পবিধান করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গে উপস্থিত হইলেই দস্যু জানাইয়া দিল—তাহার সমস্ত অলঙ্কার কাড়িয়া লইয়া হত্যা করিবার জন্য তাহাকে সেখানে আনা হইয়াছে। সুলসা কহিল—“স্বামী, তুমি আমাকে কেন হত্যা করিবে? তোমার জন্য আমি একটি ধনীর সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার প্রাণরক্ষাব জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় কবিতে আমি দ্বিধা করি নাই; প্রতি দিন আমি সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে পারি; কিন্তু তোমার জন্যই আমি আর কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহি না। আমি তোমার এত উপকার করিয়াছি; সুতরাং তুমি আমার প্রতি সদয় হও—আমাকে হত্যা করিও না।” দস্যু তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল যে, সে তাহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়াছে। ইহার পর সুলসার প্রত্যুৎপন্নমতি জাগিয়া উঠিল। সে তখন দস্যুর কাছে আলিঙ্গনের একটা ভিক্ষা যাচ্ঞা করিল। দস্যু সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আপত্তি করিল না। সুলসা অত্যন্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিতে করিতে তাহাকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিল এবং চুম্বন করিল। তাহার পর তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহাকে নমস্কার করিবার ছলে ধাক্কা দিয়া তাহাকে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিল। পতিত দস্যুটির দেহ একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ সে

মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপে বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া সুলসা গৃহে প্রত্যাগমন করে। (Cowell, Jataka, III pp. 260-263 ; পেতবত্থুর টীকা পরমত্থদীপনীর (পৃঃ ৪) বিবরণ ইহার সহিত তুলনীয়)

অদ্ধকাশী

কাশীর কোনও ধনী মহাজনের পরিবারে অর্দ্ধকাশীর জন্ম হয়। সে প্রথমে বারবণিতা হয়, পরে ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করে। দীক্ষা-গ্রহণের জন্য সে শ্রাবস্তীনগরে গমন করিতে মনঃস্থ করিয়াছিল ; কিন্তু পথে দস্যুভয় আছে জানিতে পারিয়া ভগবান্ তথাগতের নিকট দূত প্রেরণ করে। ভগবান্ বুদ্ধ এক জন জ্ঞানী এবং উপযুক্ত ভিক্ষুণী পাঠাইয়া তাহাকে উপসম্পদা দিবার জন্য ভিক্ষুদের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন। দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল এবং অনতিকাল মধ্যেই ধর্ম্মের অর্থ এবং তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল (থেরীগাথাভাষ্য, পৃঃ ৩০—৩৩)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নারীচরিত্র

নারী ভার্য্যারূপে তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

সৎ গৃহস্থ বধূ যাঁহারা তাঁহারা বিশেষ ভাবে পতির অনুরাগিণী হন। নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি পতির জন্য বিসর্জ্জন দিতে তাঁহারা কখনও দ্বিধা করেন না এবং প্রিয়তমের সেবার জন্য যে কোনও রকমের দুঃখ তাঁহারা হাস্যমুখে বরণ করেন। সেই জন্য ভার্য্যাকে পরম সখী বলা হয়। (সংযুক্ত-নিকায়, খঃ ১, পৃঃ ৩৭ ; Kindred Sayings 5 I, p 52 fn 3);

সম্বুল-জাতকে একটি পতিব্রতা রমণীর আদর্শ-চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বামী কুষ্ঠ-ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করেন। বনে যাইবার সময় তাঁহার পত্নী যাহাতে সঙ্গে না যান সে জন্য তিনি বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পত্নী তাঁহার সঙ্গিনী হন। পতির প্রতি এই মহিলাটির অনুরাগ এত গভীর ছিল যে, রাজার প্রধানা মহিষী হইয়াও, এবং আজন্ম অজস্র বিলাসের ভিতর বর্দ্ধিত হইয়াও, যে সমস্ত রমণী চিরকাল দুঃখকষ্টে অভ্যস্ত, তাহাদের মতই তিনি ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর সেবার ভার গ্রহণ করেন। প্রত্যহ প্রত্যুষে তিনি শয্যা ত্যাগ করিতেন। স্বহস্তে গৃহ-মার্জ্জনা করা, পতির পানের জন্য জল রাখা, তাঁহার

দন্ত-ধাবনের কাঠ, মুখ ধুইবার জল দেওয়া—এগুলি তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল। ইহা ছাড়া স্বহস্তে নানা প্রকারের ঔষধের গাছ গাছ্ড়া পেষণ করিয়া স্বামীর ক্ষতমুখে প্রলেপ রচনা করিয়া দিতেন। প্রত্যহ ঝুড়ি, কোদাল ও কাস্তে হাতে বনে প্রবেশ করিয়া স্বামীর জন্য বন্যফল এবং গাছ-গাছড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। এইরূপে কুষ্টরোগ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বনের ভিতর তিনি স্বামীর সেবা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই অকৃতজ্ঞ স্বামীটি গৃহে ফিরিয়া পত্নীর সেবার কথা, বিস্মৃত এমন কি তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া অন্যান্য নারীর সহিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত হন। স্বামীর এই অবহেলা তাঁহার হৃদয়ে যে কি গভীর বেদনার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রতিদ্বন্দ্বী রমণীদের প্রতি ঈর্ষায় ক্রমে ক্রমে তাঁহার দেহ এরূপ ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইয়া যায় যে, তাঁহার দেহের ত্বক্ ভেদ করিয়া শিরা উপশিরা গুলি পর্য্যন্ত দেখা যাইত। স্বামীর প্রতি এই রমণীটির অনুরাগ যে কত গভীর ছিল তাহা তাঁহার একটি কথা হইতেই ধরা পড়ে। ব্যথায় অভিভূত হইয়া তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন—"বহুমূল্য বেশ-ভূষায় সজ্জিত নারীও যদি স্বামীর ভালবাসা না পায় তবে দড়ি বাঁধিয়া তাহার আত্মহত্যা করা উচিত।" যে ভালবাসা কিন্তু এত গভীর তাহা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না। এই পতিব্রতা পত্নীটি কোনও সাধুর চেষ্টায় অবশেষে স্বামীর ভালবাসা ফিরিয়া পাইয়া পূর্ব্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। (জাতক, সং ৫১৯)

কক্কটা জাতকে নারীর পাতিব্রত্যের আর একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। একদা কয়েক জন দস্যু শ্রাবস্তী নগরের কোনও ভূম্যধিকারী এবং তাহার পত্নীকে আক্রমণ করে। এই জমিদারের পত্নীটি অসামান্যা রূপ-লাবণ্যসম্পন্না রমণী ছিলেন। তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া দস্যু-সর্দ্দার তাঁহার স্বামীকে হত্যা করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকটি কিন্তু অত্যন্ত সৎ, ধর্ম্মশীলা এবং পতিগতপ্রাণা ছিলেন। তিনি স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য দস্যু-সর্দ্দারের পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"হে প্রভু, আমার ভালবাসা লাভ করিবার জন্য আপনি যদি আমার স্বামীকে হত্যা করেন তবে, আমি বিষ পান করিয়া অথবা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিব। আমি কিছুতেই আপনার সঙ্গে গমন করিব না; সুতরাং আমার স্বামীকে আপনি হত্যা করিবেন না।" এইরূপে এই মহিলাটি তাঁহার নিজের এবং তাঁহার স্বামীর প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন (জাতক, সং ২৬৭)।

ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর দৃষ্টান্ত প্রচুর সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যায়। সুজাতার উপাখ্যান আমরা জানি। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণা, কর্ত্তব্যপরায়ণা ও সাধ্বী রমণী ছিলেন এবং স্বামী ও শ্বশুরের প্রতি কর্ত্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালন করিতেন (জাতক সং ১৯৪)। আর এক জন ছিলেন অসিতাভু। তিনি যেমন সুন্দরী ছিলেন ধর্ম্মের প্রতি আসক্তিও তাঁহার তেমনি প্রবল ছিল। তাঁহাকে অবহেলা করিয়া তাঁহার

স্বামী অন্যত্র আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকিতেন। স্বামীর এই অবহেলাও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। একদা তিনি গৃহে ভগবান্ বুদ্ধের দুই জন প্রধান শিষ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন এবং তাঁহাদিগকে নানা রকমের উপহার প্রদান করেন। অবশেষে তাঁহাদেরই উপদেশে তিনি প্রথম সোপানে আরোহণ করিবার শক্তি অর্জ্জন করেন এবং স্বামীর তাঁহাকে প্রয়োজন নাই বুঝিতে পারিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কালে তিনি ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন (জাতক সং, ২৩৪)। রাহুলের জননী আর এক জন পতিব্রতা রমণী ছিলেন। স্বামী ও পুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তিনিও গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগকরেন। (জাতক সং ২৮১)। প্রকৃত পতিব্রতা রমণী স্বামীর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমানা হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। প্রমাণ-স্বরূপ কোসল দেবীর কথা বলা যায়। ইহার স্বামী স্বীয় পুত্রের দ্বারা নিহত হন। স্বামীর শোকে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। (জাতক, সং ২৩৯)। সাধ্বী স্ত্রীলোকেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ পছন্দ করিতেন না। স্বামীকে সঙ্ঘে যোগদান করিতে দেখিলে সন্তান ক্রোড়ে বিচিত্র বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া তাঁহারা স্বামীর সম্মুখে নানা রকমের প্রলোভন বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের এ চেষ্টা প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যর্থ হইয়াছে। (Psalms of the Brethren, pp. 15-16, 184 & 226) এই মহিলাদের এক জন স্বামীর বাক্য শুনিয়া এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে স্বামি-পরিত্যক্ত অবস্থায় গার্হস্থ্য-জীবন

যাপন করাই তিনি অনাবশ্যক বলিয়া মনে করেন, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভিক্ষুনী সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন (Psalms of the Brethren, p. 14)।

স্বামীর নামেই স্ত্রীলোকের পরিচয় দিবার রীতি ছিল। (ভত্তা পঞ্ঞানং ইত্থিযাতি—সংযুক্ত-নিকায়, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪২) "সম্রাটের কন্যা হইলেও বিবাহিতা নারী অমুক বা অমুকের পত্নী রূপেই পরিচিতা হইতেন। কেবল মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই সকল স্থলে রমণীরা তাহাদের পুত্রের বা নিজের নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রমাণ-স্বরূপ বিসাখার নামের উল্লেখ করা যায়। (Kindred Sayings, I p 58 f.n. 3। নারী শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌রূপে (ইত্থি ভণ্ডানম উত্তমম্)পরিগণিত হইত, সংযুক্ত-নিকায় (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩; "যে হেতু তাহার প্রয়োজন অপরিহার্য্য অথবা যে হেতু তাহারই গর্ভে বোধিসত্ব ও পৃথিবীর সাধকেরা জন্মগ্রহণ করেন। (Commentary, Kindred Sayings. Ip. 62, fn. I).

বুদ্ধ নিজে বলিয়াছেন যে, কন্যা যদি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ধর্ম্মপ্রাণ, স্বামী এবং শ্বশুরের প্রতি অনুরক্ত হয়, তবে সেরূপ কন্যা পুত্রের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। সেরূপ কন্যাদ্বারা রাজ্যশাসনও অসম্ভব নহে। স্ত্রীলোকের রাজ্য শাসনের উল্লেখ মহাবংসে পাওয়া যায়। রাণী অনুলা চারি মাস রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। (অধ্যায় ৩৪, শ্লোক ২৭) আমণ্ড-কন্যা এবং চূড়াভয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী সিবলী চারি মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। (অধ্যায় ৩৫, শ্লোক ১৪)।

এরূপ কন্যার পুত্র বীর হয় এবং দেশ-বিদেশের শাসক হয়। (সংযুক্তনিকায়, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৮৬)

নারীর দুশ্চরিত্রতা

যেমন সাধ্বীও সচ্চরিত্রা নারী আছে, তেমনি অসচ্চরিত্রা নারীরও অভাব নাই। পঁচিশটি বিভিন্ন উপায় আছে যাহা দ্বারা অসৎ-চরিত্রা নারীকে চিনিতে পারা যায়। অসৎ-চরিত্রা নারী গৃহ হইতে স্বামীর অনুপস্থিত কামনা করে, স্বামীর প্রত্যাগমনে সে সুখী হয় না, সে তাঁহার কুৎসা রটনা করে, তাঁহার প্রশংসা সম্বন্ধে সে নীরব থাকে, সে তাঁহার কাজের ক্ষতি করে, কখন তাঁহার লাভের দিকে চায় না, সর্ব্বদা এমন সব কাজ করে যাহা করা উচিত নহে এবং যাহা করা উচিত তাহা কখনও করে না। পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়াই সে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্বামীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া শয়ন করে, সে ঘন ঘন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, মহা হাঙ্গামা বাধায়, সে সর্ব্বদা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে, সে অকারণে বেদনা অনুভব করে, সে অকারণ বার বার ছল করিয়া বাহিরে যায়, সে খিট্‌খিটে মেজাজে কাজ করে, সে অপরিচিত লোকের কথায় কান দেয় এবং তাহারা যাহা বলে মনোযোগ সহকারে শোনে। স্বামীর জিনিষ পত্র সে নষ্ট করে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশে, দূরতর স্থানে ভ্রমণ করে, সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সে পরপুরুষের সহিত ব্যভিচার করে, সে তাহার স্বামীকে সম্মান করে না, সে নির্লজ্জের মত রাস্তার লোকদের সম্মুখে আপনাকে প্রকাশ করে এবং অব্যবস্থিত চিত্তে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া সে সর্ব্বদা

চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে (Fausboll, Kunala Jataka V, pp 434—435.)

নয়টি কারণে স্ত্রীলোকদের উপর দোষ আরোপ করা হয়। প্রমোদউদ্যানে, বাগানে, নদীতীরে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতে, অথবা অপরিচিতের গৃহে যে স্ত্রীলোক প্রতিনিয়ত গমনাগমন করে, জাঁকজমকশালী পরিচ্ছদে দেহ ভূষিত করে, তীব্র পানীয় পান করিতে অভ্যস্ত হয়, যে স্ত্রীলোক অলস দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করে অথবা দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে সে স্ত্রীলোক ভাল নহে। অসৎ চরিত্রা নারী আটটি কারণে স্বামীকে অপছন্দ করে। স্বামী যদি দরিদ্র, বৃদ্ধ, মদ্যপ, দুঃসাহসী, নির্ব্বুদ্ধি, ব্যবসার গুরুভারে উৎপীড়িত, অথবা বনিতার সন্তোষ-বিধানে তৎপর না হয়, তবে অসৎ স্ত্রীলোক সেরূপ স্বামীকে পছন্দ করিতে পারে না। (Fausboll, Jataka, V. 433)

দুশ্চরিত্রা স্ত্রী নিজের অদৃষ্টেও সন্তুষ্ট নহে। তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ যে কোনও উপায়ে পারে আদায় করিয়া লয়। স্বামীর দারিদ্র্যের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। একদা একটি দরিদ্র লোকের স্ত্রী কুসুম্ভ রংএর কাপড় পরিয়া উৎসবে যোগদান করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। লোকটি এতই দরিদ্র ছিল যে সেরূপ বস্ত্র সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কোনওরূপেই সম্ভবপর ছিল না। স্ত্রী কিন্তু তাহার দারিদ্র্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বস্ত্রের জন্য তাহাকে পুনঃপুনঃ উত্যক্ত করিতে থাকে। অবশেষে স্বামীকে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও কোনো শিল্প-

সংরক্ষণাগার হইতে কুসুম্ভ রংএর এক খানি বস্ত্র চুরি করিয়া আনিতে বাধ্য হইয়াছিল (জাতক সং ১৪৭)। দুশ্চরিত্রা পত্নী অসুস্থতার ভাণ করিয়া গৃহকার্য্য অবহেলা করে এবং স্বামী অনর্থক তাহাকে ব্যাধিমুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করেন (জাতক সং ১৩০)।

যুবতী ভার্য্যার কৌশলে পরিবারের ভিতর কলহ ও অশান্তি যে কিরূপ ভাবে বাড়িয়া উঠে তাহার পরিচয় কচ্চানি জাতক হইতে পাওয়া যায় (সং ৪১৭)। যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা করিতে তো চায়ই না, উপরন্তু শাশুড়ীর বিরুদ্ধে নানা কথা লাগাইয়া স্বামীর চিত্ত বিষাক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। (জাতক, সং ৪৪৬)।

চুল্লপদুম জাতকে স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার একটি বীভৎস বিবরণ পাওয়া যায়। এক জন লোক তাহার স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। এত ভালবাসিত যে একদা পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়, তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িলে নিজের দক্ষিণ জানুতে ক্ষত উৎপাদন করিয়া রক্তের দ্বারা তাহার স্ত্রীর তৃষ্ণা নিবারণ করে। এই দম্পতি গঙ্গাতীরে একটি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকে। অতঃপর এক দিন স্বামী দেখিতে পাইল যে, একটি তস্কর হস্ত, পদ, নাসিকা এবং কর্ণ কর্ত্তিত অবস্থায় চীৎকার করিতে করিতে নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দয়াপরবশ হইয়া এই তস্করটিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া সে ঔষধ দিয়া, তাহাকে আরোগ্য করিয়া তুলে। কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু স্ত্রীটি এই তস্করের সঙ্গে প্রেমে পড়িয়া গেল। ইহার পর স্বামীকে হত্যা করার উপায় উদ্ভাবন

করিতেও তাহার দেরী হইল না। এক দিন পাহাড়ের উপরে লইয়া গিয়া পর্ব্বতের দেবতাকে পূজা করিরার ছলনায় স্ত্রী স্বামীকে পশ্চাদ্দেশ হইতে আঘাত করিয়া এবং দেহটা পাহাড়ের উপর হইতে নীচের গহ্বরে ফেলিয়া দিয়া মহানন্দে গৃহে ফিরিয়া আসিল (জাতক সং ১৯৩)।

অকৃতজ্ঞ এবং অসতী নারীর এই বিবরণটী যেমন ভয়াবহ তেমনই বীভৎস। স্ত্রীর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিজের রক্ত দান করিয়াও স্বামী তাহার কলুষিত হৃদয় জয় করিতে পারে নাই। উপরন্তু তাহার সেই উদারতার পুরস্কার স্বরূপ স্ত্রীর হাতেই তাহাকে জীবন-বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। স্ত্রীর ব্যভিচারের ও অকৃতজ্ঞতার এই ধরণের উদাহরণ জাতকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

বিনয় গ্রন্থেও একটি স্ত্রীর ব্যভিচারের বিবরণ আছে। স্বামী বিদেশ থাকা কালে পরপুরুষের সহ-বাসের ফলে একটি রমণীর গর্ভসঞ্চার হয়। অসময়ে সে একটি ভ্রূণ প্রসব করে। তাহার সাহায্যকারিণী জনৈক ভিক্ষুণীর সাহায্যেই এই ভ্রূণটি সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল (তৃতীয়খণ্ড, ৩৪৫)।

অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যে স্ত্রীচরিত্র চমৎকার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রমণী তাহার বিলাস, হাবভাব অহঙ্কার, চালচলন, সৌন্দর্য্য, হাস্য, রোষ, মোহকরী-শক্তি ও বাক্যের দ্বারা দেবতা, রাজা এবং ঋষিকেও জয় করিতে পারে (সৌন্দরনন্দ কাব্য—৭ম সর্গ ২৪ শ্লোক)

বিলাস-বিভ্রমশীলা নারী পুরুষের মনে লালসার উদ্রেক করে এবং যখন এই বিলাসের মোহ দূর হয় তখন ভয়ের সৃষ্টি করে। তাহারা কখনও সাহচর্য্যের উপযুক্ত নয়। তাহাদের দ্বারা বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের ভিতর বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। তাহারা পরের নিন্দা করিতেই ভালবাসে। অন্যায় করিতে তাহারা কুণ্ঠা অনুভব করে না। বাক্যের দ্বাবা তাঁহারা মুগ্ধ করে, এবং মনের ক্রূরতার দ্বারা ব্যথা দেয়। তাহাদের বাক্য অমৃতবৎ কিন্তু হৃদয় তাহাদের হলাহলে পরিপূর্ণ। নারীর হৃদয় জয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যেমন বিষবল্লরী, খাপহীন তলোয়ার, সর্পপরিপূর্ণ গিরিগহ্বরের আশ্রয় বিপদ ও মৃত্যুর কারণ, স্ত্রীলোকও তেমনি ভবিষ্যৎ বিপদের কারণ হয়। ভাল লোক যে দরিদ্র ভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহারা যে বিপদের ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়ে, যুদ্ধের জন্য তাহারা যে সৈন্যদের সম্মুখে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় তাহার কারণও নারী। দৈহিক সৌন্দর্য্য, সম্পদ, প্রতিভা বংশগৌরব অথবা শারীরিক শক্তি—নারীর কাছে ইহাদের কোনটিরই মূল্য নাই। জলজ প্রাণীতে পরিপূর্ণ নদী যেমন ভয়ের কারণ, নারীরও তেমনি দ্বিধাশূন্য চিত্তে ধ্বংস আনয়ন করে। মিষ্ট কথা, আদর যত্ন, বন্ধুত্ব এ-সব কিছুই নারী স্মরণ করিয়া রাখে না। অব্যবস্থিতচিত্ত নারীর চেয়ে খল-স্বভাব আর কাহারও নাই। যাহারা নারীকে কিছুই দেয় না, নারী তাহাদিগকেই আনন্দ দান করে, কিন্তু যাহারা তাহাদিগকে সর্ব্বস্ব দেয়, নারী তাহাদের উপরেই বিরূপ। যাহারা নারীর কাছে মাথা

নত করে তাহাদের কাছে নারীর মর্য্যাদার সীমা নাই ; কিন্তু যে পুরুষ স্পর্দ্ধার সহিত মাথা উঁচু করিয়া চলে, নারী তাহার পায়েই মাথা বিকাইয়া দেয়।

গাভীসকল একটি গোচারণ-ভূমিতে আহত হইয়া যেমন আনন্দের সহিত অন্য ভূমিতে বিচরণ করে, নারীও তেমনি পুরান বন্ধুত্ব বিস্মৃত হইয়া নূতন লোকের সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়। যদি স্বামী উপযুক্ত হয় তবেই নারী তাহাকে স্বামীর প্রাপ্য দান করে। কিন্তু তাহার যদি প্রতিভা না থাকে তবে তাহার প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার শত্রুর অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায় যদি স্বামী অর্থশালী হয়, তবে অর্থলালসায় স্ত্রী স্বামীর অনুসরণ করে, কিন্তু অর্থ না থাকিলে ঘৃণা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। যদিও স্বামীর মৃত্যুতে নারী তাহার সহিত চিতায় সহমরণে গমন করে, অথবা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে, তথাপি স্বামীর জন্য দুঃখ ভোগ করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে। কারণ তাহারা অন্তরের সহিত কাহাকেও ভাল বাসিতে পারে না। খুব অল্প স্ত্রীলোকই আছে যাহারা তাহাদের স্বামীকে দেবতার মত সেবা করে। কিন্তু সহস্র সহস্র নারী দেখা যায়, যাহাদের চঞ্চলচিত্ত নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভিন্ন আর কিছু বুঝে না। (সৌন্দরনন্দ কাব্য ৮ম সর্গ)।

বৌদ্ধ-সাহিত্যে নারীচরিত্রের উজ্জ্বল দিক্‌টাও যেমন প্রদর্শিত হইয়াছে, খারাপ দিক্‌টাও তেমনি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ভিতর নারীজাতির চরিত্রের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের একটা সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। রমণীসুলভ ধর্ম্মগুলি বিশেষভাবে ভিক্ষুণী এবং

থেরীদের জীবনের ভিতর দিয়াই উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই সব কোমলদেহা নারী ধর্ম্ম-জীবনের কঠোরতাগুলি যেরূপ ভাবে সহ্য করিয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আবার বৌদ্ধ-সাহিত্যে নারীদের দুর্ব্বলতার ছবিও যেরূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা দেখিলে ভয় এবং ঘৃণারই উদ্রেক করে। এই সব চরিত্রকে কাল্পনিক বলিয়াও মনে করিবার কারণ নাই। সেগুলিতে সত্যকে অক্ষুণ্ণ ভাবেই প্রতিফলিত করা হইয়াছে। নারীচরিত্রের এই সব ভয়াবহ বৃত্তিগুলি একত্রে সন্নিবেশিত দেখিয়া নারী-সম্বন্ধে সম্ভ্রম-সূচক মনোভাব পোষণ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়; সুতরাং যে নারীর আকর্ষণ মানুষের সাক্ষাৎ চিন্তা শক্তিকেও পরাভূত করিয়া চলে, সেই নারী সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা রূঢ় আঘাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং তাহারা নারীকে জীবন হইতে দূরে রাখিয়াই চলিতে চেষ্টা করে। এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে যে পুত্র-হত্যার চেষ্টায় মাতৃ-হৃদয়ের মমতাও শুকাইয়া গিয়াছে, কোমল হৃদয় নারীর পক্ষে পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া উঠাও অসম্ভব হয় নাই। (ধম্মপদত্থকথা, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭৪ হইতে)। মহাবংসে নারীর এইপ্রকার পাপ-প্রবণ স্বভাবের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। দেবানমপিয়তিস্স তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের রাজ্য নিজের হাতে গ্রহণ করিবার জন্য তাহার স্বামীর ভ্রাতা রাজপ্রতিভূ মহানাগকে হত্যা করিতে মনস্থ করেন। এই নিমিত্ত মহানাগকে একটি বিষাক্ত আম্র ভক্ষণ করিতে দেন।

রাণীর দুর্ভাগ্য ও মহানাগের সৌভাগ্যক্রমে আমটি রাণীর শিশুপুত্র ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল (অধ্যায় ২২)। স্ত্রী-চরিত্রকে সহজে বোঝা যায় না। সমুদ্রে মাছের গতির মত তাহারাও দুর্ব্বোধ্য (জাতক সং ৫১৯)। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ লোভ-পরায়ণ; সুতরাং চঞ্চলচিত্ত বানরের মত, গাছের ছায়ার মত, দ্রুতগতি শকটের ঘুর্ণায়মান চাকার মত তাহাদের মনও চঞ্চল। পিতামাতার ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের প্রতিও তাহাদের কোনও আকর্ষণ নাই। লজ্জাহীনার মত ব্যবহার করিতে তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করে না, এবং প্রত্যেক অধিকারের গণ্ডী তাহারা অনায়াসেই লঙ্ঘন করিয়া চলে। প্রত্যেক কাজ তাহারা নিজের মনের মত করিয়া থাকে। (Fausboll, Jataka, V. p. 445). বাক্য, হাস্য, নৃত্য ও গীতই পুরুষকে বশ করিবার তাহাদের অব্যর্থ অস্ত্র (Ibid, V. p. 452). তাহারা কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং আগুণের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী (Ibid V. p. 446). তাহাদের মন মানুষকে বিপথগামী করিবার নানা ফন্দীতে পরিপূর্ণ এবং নানারকমের ছলনায় ভরা। সত্য তাহাদের ভিতর অত্যন্ত দুর্লভ, তাহারা কখনও সত্য কথা বলে না (সচ্চম সুদুল্লভম্)। তাহারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করে (Ibid. I p 295; cf Ibid. V.p 94). কথায় তাহারা সত্য এবং মিথ্যার ভিতর কোনও পার্থক্য রাখে না। (Cowel, Jataka, V, p. 242).

স্বর্ণের জন্য বা লালসার দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়াই নারী পুরুষের সেবা করে। জ্বলন্ত আগুনের ভিতব ইন্ধন যেমন জ্বলিতে থাকে নারীও পুরুষকে সেইরূপে দগ্ধ করে। (Fausboll, Jataka, II. p. 330; জাতক সং ৫৩৬ তুলনীয়) তাহারা আমোদ প্রমোদই খুঁজিয়া বেড়ায় এবং ইন্দ্রিয়লালসারও তাহাদের অন্ত নাই। Ibid. V p. 435 and 448). তাহারা এত কাম-প্রবণ যে কোনও শাসনই তাহাদিগকে সংযত করিতে পারে না। তাহারা বাসনার পশ্চাতে ছুটিয়া চলে; কোনও বাধাই তাহাদের সে গতিকে রোধ করিতে পারে না। মুদুপাণি জাতকের (Ibid. Vol. II. p. 323) মুখবন্ধে দেখা যায়, প্রাচীন কালে জ্ঞানী মনুষ্যেরা চোখে চোখে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াও তাহাদের কন্যাদিগকে নিরাপদে রাখিতে পারেন নাই। এই মুহূর্ত্তে কন্যার পিতার হাত ধরিয়া আছে কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই পিতার অজ্ঞাতে তাহারা প্রেমাস্পদের সহিত পলায়ন করিতে পারে। পাহারার ব্যবস্থা করিয়াও নারীকে ধরিয়া রাখা যায় না। একটি রমণীকে সিমবলি হ্রদের ভিতর রাজপ্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেখানে থাকিয়াও সে তাহার পবিত্রতাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। সতর্ক রক্ষী-পরিবেষ্টিত থাকিয়াও সে ভ্রষ্টা হইয়াছিল। (Ibid. III p. 9 c.f. Ibid, p. 187). একটি বালিকা তাহার জন্ম হইতে কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদ্বারাই প্রতিপালিত হয়। স্বামী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষকে তাহার দেখিবার সুযোগ ছিল না। একটি সাত তলা বাড়ীতে

তাহাকে রাখা হয়। এই বাড়ীতে প্রবেশের সাতটি দ্বার ছিল এবং প্রত্যেকটি দরজাই সতর্ক নারী-প্রহরীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। তাহা সত্ত্বেও বালিকাটি জনৈক বাহিরের লোকের সহিত ব্যভিচার করে। এই লোকটিকে তাহার অভিপ্রায় অনুসারেই তাহার পরিচারিকা নানা কৌশলের সাহায্যে পুরী প্রবেশ করাইয়াছিল। এইরূপে ভ্রষ্টা হইয়াও সে তাহার চরিত্রের নির্ম্মলতা প্রমাণ করিবার জন্য নানারূপ কৌশল অবলম্বন করে। (Fausboll, Jataka, I, p. 289-295) গহপতি-জাতকে (সং ১৯৯) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশ্বাস-ঘাতকতা করার আরও একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে গ্রামের মোড়লের সহিত সে ব্যভিচারিণী হইয়াছিল। উচ্ছিট্ঠভত্ত-জাতকে (সং ২১২) দেখা যায় যে, একটি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্য একটি লোকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই স্ত্রীটি এত বেশী দুশ্চরিত্রা ছিল যে সে তাহার স্বামীকে ঠাণ্ডা ভাত পরিবেষণ করিয়া গরম ভাত দিয়া তাহার প্রেমাস্পদের পরিতোষ সাধন করিত। তাহার অপরাধ কিন্তু শীঘ্রই ধরা পড়ে এবং এই হীন অপরাধের জন্য তাহাকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয়। দুরাজান জাতকের (সং ৬৪) মতে পাপপরায়ণ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক যে দিন অন্যায় করে সে দিন ক্রীতদাসীর মত নম্র থাকে কিন্তু যে দিন তাহারা কোনও পাপানুষ্ঠান না করে সে দিন অত্যা-চারিণী গৃহস্বামিনীর মত তাহাদের ব্যবহার হয় উগ্র (জাতক সং ১৪৫, ১৯৮ এবং ২৬২ তুলনীয়)। একটি কনে

বহু জন পরিবৃত রুদ্ধদ্বার শকটের ভিতর থাকিয়াও বারাণসীর রাজা কণ্ডারির সহিত পাপাচরণ করিয়াছিল। স্ত্রীজাতির চরিত্রহীনতা-সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত এই নৃপতির মন্ত্রীই তাঁহাকে শিবিরাকৃতি একটি পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। (Fausboll, Jataka, V. p 439) স্ত্রীলোকের রিপু দুর্নিবার্য্য। স্বভাবতই স্ত্রীলোক অহঙ্কারী হয়। যে পুরুষের কাছে তাহাদের চিত্ত বিকাইয়া যায় তাহার সম্মুখেও তাহারা স্পর্দ্ধাকে সহজে সঙ্কুচিত করে না। একদা একটি সুন্দরী রমণী এক জন সুন্দর ভূস্বামীকে দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার সহিত প্রেমে পড়িয়া যায়। লালসা তাহার সর্ব্বাঙ্গে আগুনের মত জ্বালার সৃষ্টি করিতে থাকে। দেহ এবং মনের সমস্ত চেতনা তাহার লুপ্ত হইয়া যায়; খাদ্যের প্রতিও তাহার কোনও রূপ আশক্তি থাকে না। খাটের কাঠামোটাকে আলিঙ্গনের পাশে আবদ্ধ করিয়া সে কেবল শুইয়া থাকিত। ইহার পর তাহার বন্ধু এবং সহচরীদের চেষ্টায় এক দিন পুরুষটি তাহার সহিত দেখা করিতে স্বীকৃত হইলেন। কক্ষটি সাজাইয়া নিজের দেহকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া সে যখন বিছানায় বসিয়াছিল তখনই পুরুষটি আসিয়া তাহার পার্শ্বে শয্যায় আসন গ্রহণ করিলে, অকস্মাৎ তাহার মনে হইল যে, "ইহার সম্ভাষণগুলি যদি আমি সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করি তবে আমাকে অত্যন্ত সুলভ করিয়া তোলা হইবে এবং আমার স্পর্দ্ধাকেও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রাখা চলিবে না। প্রথম দিনেই তাহার ইচ্ছানুসারে

কাজ করা চলিতেই পারে না। প্রথম দিনে আমার নিজের খেয়ালমত চলিয়া তার পর আমি পরাজয় স্বীকার করিব।” সুতরাং পুরুষটী যেমন তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইবে, অমনি সে তাহার হাত ধরিয়া রূঢ় ভাষায় বলিল, “তোমাকে আমার প্রয়োজন নাই। এই মুহূর্ত্তে তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও।” ইহার পর ক্রোধে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষটি চলিয়া গেলেন। পরে পুরুষটিকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি আর রমণীর নিকট আসেন নাই। স্ত্রীলোকটী অবশেষে শোক করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (Fausboll, Jataka, II pp 337-340) বন্ধনমোক্ষ-জাতকে (সং ১২০) নিম্ন-লিখিত ঘটনাটির উল্লেখ আছে। এক রাণী প্রতিনিয়ত নির্ব্বন্ধাতিশয্যের দ্বারা এক রাজাকে এই শপথ করাইয়া লয় যে, তিনি কখনও অন্য কোনও রমণীর প্রতি প্রেম-পরবশ হইবেন না। রাজাকে কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া সে তাঁহার অনুপস্থিতিতে ব্যভিচার আরম্ভ করিয়া দেয়। সে ৬৪ জন দূতের সহিত পাপাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। রাজা প্রত্যন্ত প্রদেশে ছিলেন এই সমস্ত দূতকে রাণীর সংবাদ আনিবার জন্য এবং রাজার সংবাদ রাণীকে দিবার জন্য পাঠান হয়। রাজার প্রত্যাবর্ত্তনের পরে রাণীর এই পাপাচার ধরা পড়ে। রাজপুরোহিত রাণীকে দণ্ড দান করিতে নিষেধ করেন; তাঁর কারণ ছিল এই যে রমণীর কামতৃষ্ণা চির-অতৃপ্ত

এবং রাণী তাহার ভিতরের প্রকৃতি বশেই কাজ করিয়াছে। বারাণসীর রাজার প্রধানা মহিষী কিন্নরা একটি কুৎসিত খঞ্জের সহিত পাপাসক্ত হইয়াছিলেন। (Fausboll, Jataka V, pp. 437-438) রাণীর উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও রমণীরা তাহাদের কামতৃষাকে সংযত করিতে পারে না। নারী লাম্পট্যের অবতার (ইত্থিয়ো অসাতা নাম) (Fausboll, Jataka, Vol. I, p. 188,) অসংযত কাম-প্রবৃত্তির দ্বারা অন্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া নারী স্বীয় পুত্রের সহিত ব্যভিচারেও কুণ্ঠিত হয় না, অথবা যদৃচ্ছা মনোমত লোকের সহিত কামাচারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য যে পুত্রকে বক্ষঃস্তন্যে সে লালন করিয়াছে তাহাকে হত্যা করিতেও পশ্চাদপদ হয় না। অসাতমন্ত-জাতকে (Ibid, pp. 285-288) নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ আছে। একটি অন্ধ স্থবিরা রমণী তাহার পুত্রের একটি ছাত্রের কাছে স্বীয় প্রশংসা শুনিয়া মনে করে, ছাত্রটি তাহার সহিত প্রেমে পড়িয়াছে। লালসা তাহার মনের ভিতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। (অন্ধায় জরাজিণ্ণায় অভ্যন্তরে কিলেশো উপ্পজ্জি।) সুতরাং এক দিন লজ্জার আবরণ উন্মোচন করিয়া ছাত্রটিকে সে বলিল—"তুমি কি আমার সহিত কামক্রিয়ায় রত হইতে চাও?" (ময়া সদ্ধিম্ অভিরামিতুম ইচ্ছসীতি) ছাত্রটি সম্মতি জানাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানাইয়া দিল যে সে পথে তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রভুই প্রধান প্রতিবন্ধক। স্ত্রীলোকটি কহিল—"যদি তুমি ইচ্ছা কর আমি আমার পুত্রকে হত্যা করিতে পারি।" (পুত্তম্ মে

মারেহীতি)। অতঃপর তাহাই স্থির করিয়া এক গাছি তারের সাহায্যে কুঠার হস্তে সে তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রকে হত্যা করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হয় এবং একটি কাষ্ঠ মূর্ত্তিকে তাহার পুত্র মনে করিয়া সত্যই সেই মূর্ত্তির গ্রীবাদেশে কুঠারের দ্বারা আঘাত করে। স্ত্রীলোক এমনি কামপ্রবণ, দুশ্চরিত্র এবং অধঃপতিত যে কাম-প্রবৃত্তি যখন তাহাদের প্রবল হয় তখন এইরূপ জরাজীর্ণা বৃদ্ধা নারীও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুত্রের রক্তপানের জন্য মত্ত হইয়া উঠে। (Cowell, Jataka, I, p. 149)

অবদান-কল্পলতাতে স্ত্রীলোকেব কামুকতার একটি বীভৎস ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। উজ্জয়িনীর বণিক চন্দনদত্তের পত্নীর নাম কামকলা। বাণিজ্য-ব্যপদেশে চন্দনদত্ত বিদেশে গমন করিলে কামকলা অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া উঠে। কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করে। কিন্তু তাহার পরিচারিকা তাহাকে এই বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত করে যে, গৃহে থাকিয়াও গোপনে প্রবৃত্তির ক্ষুধা মিটান যায়। অবশেষে তাহারই কৌশলে অন্ধকার স্থানে কামকলার নিজের পুত্র অশ্বদণ্ডের সঙ্গে কামকলার মিলন সংঘটিত হয়; কিছুদিন পরে কামকলা পুত্রকে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিল এবং গৃহপ্রত্যাগত স্বামীকে পুত্রের দ্বারা হত্যা করাইয়া তাহার সহিত বিদেশে চলিয়া গেল। সেখানে অশ্বদণ্ড এবং কামকলা স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করিতে থাকে। কিন্তু যে বিশ্বাসঘাতকতা কামকলা তাহার স্বামীর সহিত করিয়াছিল আবার

তাহার পুনরভিনয় করিতেও তাহার দেরী হইল না। এবার সুন্দর নামক একটী বণিকপুত্রের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত সে গুপ্তপ্রণয়ে মাতিয়া উঠিল। পুত্র অবশেষে এই গুপ্ত-প্রণয়ের রহস্য জানিতে পারিয়া স্বহস্তে মাতাকে হত্যা করিয়া তাহার দ্বিতীয়বার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দণ্ড প্রদান করে; (ধর্ম্মরুচি অবদান)

সম্রাট অশোকের পত্নী তিষ্যরক্ষা তাহার সপত্নী-পুত্র কুণালের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হন। লজ্জার আবরণ উন্মোচন করিয়া এক দিন অবশেষে তিনি কুণালের প্রেমযাচ্ঞা করেন কিন্তু তিরস্কৃত এবং প্রত্যাখাত হন। এই প্রত্যাখ্যানে ক্রুদ্ধ হইয়া কুণালের অপকার করিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনের ভিতর জাগিয়া উঠে। এই সময় কুণাল সম্রাটের দ্বারা তক্ষশীলা জয় করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ইতিমধ্যে সম্রাট অশোক পীড়িত হইয়া পড়েন। সমস্ত চিকিৎসকের চেষ্টাও তাহাকে এই রোগ হইতে যখন মুক্ত করিতে পারিল না, তখন তিষ্যরক্ষার সেবায় তাঁহার রোগমুক্তি ঘটে। পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট তিষ্যারক্ষাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তিনি চাহিলেন—সপ্তাহ কালের জন্য রাজ্যশাসনভার তাঁহার উপর অর্পিত হোক্। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। শাসন-ভার হাতে পাইয়াই তিষ্যরক্ষা তক্ষশীলার কুঞ্জরকরনের কাছে রাজকীয় নিদেশ জ্ঞাপন করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে এই আদেশ থাকিল যে, কুণালের দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাকে নগ্নাবস্থায় যেন রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া

হয়। পত্র পাঠ করিয়া কুণাল স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার পর তাহার স্ত্রী কাঞ্চন-মালাকে সঙ্গে লইয়া তক্ষশীলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকের জীবন গ্রহণ করিলেন। ইহার বহু দিন পরে কুণাল পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হস্তীশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এক দিন তিনি বাঁশী বাজাইতে-ছিলেন, সেই বাঁশীর সুর হঠাৎ সম্রাটের কাণে প্রবেশ করিল। তিনি বাঁশী শুনিয়াই কুণালকে চিনিতে পারিলেন। অতঃপর কুণালের নিকট হইতে তিষ্যরক্ষা-সম্পর্কিত তিনি সমস্ত কথাই অবগত হন। ক্রোধান্ধ হইয়া তিনি তিষ্যরক্ষাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু কুণালের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে ক্ষমা করিতে বাধ্য হন। (কুণাল-অবদান)

রৌরুকা প্রদেশের রাজা শিখণ্ডি, পিতাকে হত্যা করিয়া যখন শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন, তখন তাহার মাতা শোক নিবারণের জন্য তাঁহাকে বলেন, শিখণ্ডি তাঁহার পিতা ছিলেন না। গুপ্ত প্রণয়ের ফলে অন্য লোকের ঔরসে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সুতরাং পিতৃহত্যার পাপ তাহাকে স্পর্শ করে নাই (উদ্রায়নাবদান)। রাজার শোক অপনোদনের চেষ্টায় রাণীর এই স্বীকারোক্তিতে তাঁহার নিজের চরিত্রে কলঙ্কও যেমন ধরা পড়িয়াছে, তেমনি রাজ-অন্তঃপুরও যে সময়ে সময়ে দুশ্চরিত্র লোকদের দ্বারা গোপনে কলুষিত হইত তাহারও একটি চিত্র সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। একদা বারাণসীর প্রধান মন্ত্রী রাজ-অন্তঃপুরে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। রাজা স্বচক্ষে এই ঘৃণ্য অপরাধ প্রত্যক্ষ

করিয়া মন্ত্রীকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলন। (জাতক, সং ৩০৩)

পঞ্চপাপা পেলবস্পর্শের জন্য বিখ্যাত ছিল। দুই জন রাজা ভাগ করিয়া তাহাকে ভোগ করিতেন। প্রত্যেকের ভোগের সময় সাত দিন করিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। এক দিনের গৃহে সে সাত দিন অতিবাহিত করিত এবং তাহার পর জাহাজে চড়িয়া অন্য রাজার গৃহে গমন করিত এবং স্রোতের মধ্যে নদীবক্ষে জাহাজের পরিচালকের সঙ্গে ব্যভিচারে রত হইত। এই পরিচালকটি খঞ্জ, কেশহীন, এবং বৃদ্ধ ছিল (Fausboll, Jataka, V. p. 440 foll.)

রাজভৃত্যের সহিত রাণী পীঙ্গিয়ানির ব্যভিচার স্ত্রীলোকের বিশ্বাসঘাতকতার আর একটি উদাহরণ। রাজা নিদ্রিত হইলে সে প্রতি রাত্রেই জানালা দিয়া নামিয়া গিয়া ভৃত্যের সহিত পাপাচারে রত হইত এবং আবার জানালা দিয়াই উঠিয়া আসিয়া গন্ধদ্রব্যের দ্বারা অঙ্গ ধৌত করিয়া রাজার নিকটে শয়ন করিত। রাত্রি দ্বিপ্রহরেও তাহার অঙ্গের শৈত্য রাজার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। এক দিন তিনি গোপনে সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহার পর এই ব্যভি-চারিণীকে যথোচিত দণ্ডবিধান করেন। পৃথিবীজয়ী ব্রহ্মদত্তের পত্নী হইয়াও পীঙ্গিয়াণি স্বামীর ভৃত্যের সহিত পাপাচারে মত্ত হইয়াছিল এবং কামুকতার দ্বারা রাজা এবং ভৃত্য উভয়ের প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। (Fausboll, Jataka, V. p 444)

কল্যাণীর রাজা তিস্সের রাণী তাঁহার দেবর

অয়্য়-উত্তিকের সহিত অবৈধ প্রেমে পতিত হন। এই ব্যভিচারের কথা রাজা যখন জানিতে পারিলেন তখন অয়্য় উত্তিক সাম্রাজ্য হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু রাণীর প্রতি দণ্ড প্রয়োগের কোন কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। (মহাবংস, পৃঃ ১৭১)। এক জন রাণী তাঁহার স্বামীর ভ্রাতা অভয়নাগের সহিত পাপাচারে রত হয়। কালক্রমে এই অভয়নাগ রাজাকে হত্যা করিয়া রাজা হন। বড় ভাইএর এই পত্নীটিকেই তিনি রাণীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। (মহাবংস, পৃঃ ২০৯)। অনুলা এক জন দুশ্চরিত্রা রাণী ছিলেন। তিনি যথাক্রমে এক জন প্রাসাদ-প্রহরী, এক জন সূত্রধর, এক জন কাষ্ঠবাহক এবং রাজপুরোহিতের সহিত প্রেমে পড়েন এবং প্রত্যেকের সহিত পাপাচারে রত হন। ইহাদেব প্রত্যেককেই তিনি বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। (মহাবংস ২৭৯ পৃঃ)। দুশ্চরিত্রা অনুলার দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, রমণীর কামতৃষ্ণার শেষ নাই, এবং এই কামতৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য তাহারা নরহত্যা করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। কোনও স্ত্রীলোকেই তাহার নিজের গৃহে আনন্দ পায় না। স্বামী সবল এবং কামপ্রবণ হইলেও স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করে। সে যে-কোনও লোকের সহিত ব্যভিচারে রত হয়—এবং খঞ্জকেও বাদ দেয় না। (Fausboll, Jataka, V. p. 440). দশ পুত্রের মাতা হইলেও তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না (Ibid p. 448) সবল, অনুগত এবং নারীর কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সমর্থ এরূপ আটটি স্বামী থাকিলেও

নারী তৃপ্ত হয় না সে নবমটির উপর ভালবাসা অর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে; কারণ সে আরও কিছু চায়। (Fausball, Jataka, V. p 450) বুভুক্ষিত গাভী যেমন নূতন নূতন গোচারণ ভূমি খুঁজিয়া বেড়ায়, নারীও তেমনি সম্পদশালী প্রেমিকের সন্ধানে ফেরে। (Ibid. p. 446 ; cf. Ibid. I, p 295) এক জনের অনুরাগিণী হইয়া থাকা তাহাদের পক্ষে কদাচিৎ সম্ভবপর হয় (জাতক সং ৫০৭)। যদি গোপন স্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে সুবিধা পায় তবে প্রত্যেকটি নারী ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হয়। যদি অন্য কোনও লোককে না পাওয়া যায় তাহা হইলে কুব্জপৃষ্ঠ বামনের সঙ্গে ব্যভিচার করিতে রমণী দ্বিধাবোধ করে না। (Fausbo'l, Jataka V. p. 435). এমন কি তাহারা সাধুসন্ন্যাসীদেরও মতিভ্রম ঘটায়, এবং নারীসুলভ হাবভাব বিলাসকলা দ্বারা যোগী ঋষিদিগকেও ধর্ম্মভ্রষ্ট করে। (জাতক সং ৬৩, ২৬৩, ৫০৭, ৫২৩, এবং ৫২৬)। দেখিতে তাহারা পদ্মের ন্যায় সুন্দর, তাহাদের স্ফুট-নোন্মুখ সৌন্দর্য্য সাধারণ মানুষ এমন কি সন্ন্যাসীদের মনেও কামপ্রবৃত্তির উদ্রেক করে এবং তাহাদিগকে উন্মাদ করিয়া তোলে। (জাতক সং ৬৬, ৫২৩, এবং ৫২৭) তাহারা কাহাকেও হাসি ও দৃষ্টির দ্বারা, কাহাকেও অদ্ভুত ছদ্মবেশের দ্বারা, আবার কাহাকেও মিষ্ট কথার দ্বারা মুগ্ধ করে। (জাতক সং ৫৩৬)

পুরুষের কাছে নারী যে সব ভাবভঙ্গী করে তাহা চল্লিশ প্রকারের। সে কার্য্যশক্তির পরিচয় দেয়, সে দেহকে নমিত করে, ক্রীড়াচ্ছলে লাফাইয়া বেড়ায়,

লজ্জিত ভাব দেখায়, নখ খুঁটিতে থাকে, এক পায়ের উপরে অন্য পা স্থাপন করে, কাঠির দ্বারা ভূমিতে আঁচড় কাটে, তাহার শিশুপুত্রকে নানা ভঙ্গীতে নাচায়, সে নিজেও খেলা করে এবং বালককেও খেলায় যোগদান করায়, সে নিজেও চুমা খায় এবং বালককের দ্বারা আপনাকে চুমা খাওয়ায়, সে নিজে খায়, এবং তাহাকেও খাইতে দেয়, সে কখনও দান করে কখনও বা যাজ্ঞা করে, যাহা কিছু করা যায় সে তাহারই অনুকরণ করে, সে কখনও উচ্চ স্বরে, আবার কখনও নিম্ন স্বরে কথা বলে, কখনও বা তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়, কখনও বা সুস্পষ্ট হয়। নৃত্য, বাদ্য এবং গান দ্বারা সে পুরুষের চিত্ত জয় করিতে চেষ্টা করে, অথবা তাহাদের বিস্ময় উৎপাদনের চেষ্টা করে কিংবা নানা অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া হাসে বা তাকায়। সে তাহার পরিচ্ছদ ঝাড়ে, কটিদেশের বসন নাড়া দেয়, পা আচ্ছাদিত করে বা অনাবৃত করে, বক্ষ, বাহুমূল, নাভিদেশ উন্মুক্ত করে, চক্ষু বন্ধ করে, ভ্রূ বিস্ফারিত করে, অধর ও জিহ্বা দংশন করে, জিহ্বা বাহির করে দেয়, পরিধেয় বস্ত্র একবার আঁটিয়া পরে আবার ঢিলা করিয়া দেয়, অবগুণ্ঠন কখনও টানিয়া দেয়, কখনও খুলিয়া ফেলে। (**Fausboll, Jataka, V, pp. 433-434**). চতুরা রমণী, সুন্দরী রমণী, প্রতিবেশীর পত্নী, বহুজন-প্রসংশিতা নারী, এবং যাহারা সঙ্গীরূপে বরণ করিবার জন্য ধনীলোকের অন্বেষণ করে—এই পাঁচ রকমের নারীকে সকলেরই পরিহার করিয়া চলা কর্ত্তব্য। (**Ibid. I, p. 446**)

যে সব নারীকে পাজপথে কোন প্রাসাদ কক্ষে, রাজ-ধানীতে অথবা ছোট সহরে দেখা যায় তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া চলা উচিত। যে লোক বিখ্যাত বা সর্ব্ব-জন-সম্মানিত হইতে পারিত সে যদি রমণীর প্রভাবে পড়ে, তবে চাঁদের আলো যেমন রাহুর দ্বারা ম্লান হয়, তাহার সমস্ত গৌরবও নষ্ট হয়। (Ibid, p. 453)

বৌদ্ধ-সাহিত্যে নারী-প্রকৃতির সহজাত দোষের যে সকল ভয়াবহ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় এখানে আমরা সেই সব চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছি। সামাজিক পদ-মর্য্যাদা ও আর্থিক অবস্থাব কথা বিস্মৃত হইয়া তাহারা যে কিরূপে পাপাচারে রত হয় এবং স্বামীকে ছলনা করে এই সব চিত্র হইতেই তাহা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভ্রষ্ট-চরিত্রা নারীদের ব্যভিচার ধরা পড়িলে তাহাদিগকে দণ্ডভোগ করিতে হইত। মৃত্যু, কারাদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদ, দেহাংশ খণ্ডিত করিয়া হত্যা—ব্যভিচারিণীদের জন্য এই সমস্ত দণ্ড নির্দ্দিষ্ট ছিল। (Fausboll, Jataka V, p. 444) কিন্তু ব্যভি-চারের অপরাধে বিবাহবন্ধন-ছেদের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না, যদিও সে যুগে বিবাহবন্ধনচ্ছেদের ব্যবস্থা অজ্ঞাত ছিল না। সতীত্বের মর্য্যাদাহানির জন্য নারীর প্রতি যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল তাহাতেই বোঝা যায়, তখনকার দিনে সতীত্ব বিশেষ গৌরবের বস্তু ছিল।

উপরে নারীদের লাম্পট্য এবং ব্যভিচারের যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহা হইতে এ কথা মনে করিবার

কোনও কারণ নাই যে, সতীত্ব সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য নারীদের চেষ্টা ছিল না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বৌদ্ধ-সাহিত্যে নারীর সতীত্ব একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে। দীঘ-নিকায় গ্রন্থের মহাপরি-নিব্বাণ সুত্তন্তে লিচ্ছবিদের সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সতীত্বভ্রষ্ঠ হওয়া একটি গুরুতর অপরাধ। বিবাহের অবিচলিত নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিজ্ঞা হইতে যে নারী ভ্রষ্ট হইয়াছে তাহার দণ্ড এত কঠোর যে স্বামী তাহাকে হত্যা করিলেও তাহাতে তাহার অপরাধ হইত না। লিচ্ছবিদের প্রসঙ্গে বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন—"লিচ্ছবি বংশের কোনও রমণী বা বালিকাকে বলপূর্ব্বক বা ছলনার দ্বারা কেহ বিপথগামী করিতে পারে নাই।" অণ্ডভূত জাতকে সতীত্বের প্রমাণের জন্য 'অগ্নি-পরীক্ষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (Fausboll, Jataka, I, p 294). মহাউম্মগ্‌গ-জাতক (সং ৫৪৬) হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বর বিবাহের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত উপায়ে কনের সতীত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন—

বর প্রথমে কনেকে দ্বাররক্ষীর গৃহে বসাইয়া আসি-লেন। তার পর কতকগুলি লোকের হাতে সহস্র মুদ্রা দিয়া তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। দ্বাররক্ষীর স্ত্রীকে এই পরীক্ষা গ্রহণের কথা পূর্ব্বেই জানাইয়া রাখা হইয়াছিল। লোকগুলি আদেশ অনুসারেই কাজ করিল। তাহারা কন্যাটিকে অর্থদ্বারা প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিল—

"এই মুদ্রাগুলি আমার প্রভুর পদধূলিরও উপযুক্ত নহে।" সুতরাং ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া অনুচরেরা বরকে সমস্ত কথা জানাইল। তিন বার এইরূপে তাহার কাছে লোক প্রেরণ করা হইল; তিন-বারই একই উত্তর পাইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। চতুর্থ বারে বর অনুচরদিগকে আদেশ দিলেন, মেয়েটিকে জোর করিয়া টানিয়া আন। এ আদেশও প্রতি-পালিত হইল। বর নূতন বেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন। এই নূতন পরিচ্ছদে কনে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাঁহার দিকে তাকাইয়া তাহার মুখে একই সময়ে হাসি এবং কান্নার রেখা ফুটিয়া উঠিল। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিল, "আমি এই মনে করিয়া হাসিলাম যে, ইহার মুখে যে দীপ্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে তাহা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের কোনও সুকৃতির ফল। আমার কান্নার কারণ, এইরূপ শ্রীসম্পন্ন পুরুষকেও পরস্ত্রীর প্রতি পাপাচার অনুষ্ঠান করার অপরাধে নিরয়গামী হইতে হইবে। এই উত্তরের পর স্ত্রীলোকটি দেহে এবং মনে সাধ্বী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে এক জন রমণী যেরূপে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল মতুলখ খণ জাতকে (সং ৬৬) তাহার একটি বিবরণ পাওয়া যায়। একদা এক জন সুসজ্জিতা রাণীর প্রতি জনৈক সন্ন্যাসীর দৃষ্টি পতিত হয়। তাহাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী আর তাহার চরিত্রের উচ্চতর আদর্শকে ঠিক রাখিতে পারিল না। কামতৃষ্ণা তাহার ভিতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

এইরূপে রাণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সে এক সপ্তাহ কাল তাহার নিজের কুটীরে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও শয্যায় শুইয়া কাটাইয়া দিল। সপ্তম দিবসে রাজা তাহার কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহাকে উক্ত ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কোন কথা গোপন না করিয়া কহিল—"মহারাজ আমি আপনার রাণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কাম-তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়াছি।" রাজা সন্ন্যাসীর কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য রাণীকে দান করিলেন বটে, কিন্তু গোপনে সন্ন্যাসীকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার কথাও তাঁহাকে বলিয়া দিতে বিস্মৃত হইলেন না। প্রাসাদ হইতে রাণী সন্ন্যাসীকে কহিলেন—"এইবার যাও, রাজার নিকট হইতে আমাদের উপযুক্ত গৃহের ব্যবস্থা করিয়া আইস।" সন্ন্যাসী রাণীর আদেশ পালন করিল। তাহার পর গৃহে প্রবেশ করিয়া রাণী অনবরত তাহাকে একটির পর একটি কাজের জন্য আদেশ করিতে লাগিলেন। কোনরূপ বিরক্তি-বোধ না করিয়া সন্ন্যাসী সে সব আদেশ পালন করিল। তাহার পর সে শয্যায় রাণীর পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিতেই রাণী শ্মশ্রু ধরিয়া তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "আপনি যে সাধু, আপনি যে ব্রহ্মণ, সে কথা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন!" এই ধিক্কারের ফলেই সন্ন্যাসীর চৈতন্যোদয় হয় এবং রাণীর সতীত্বও রক্ষিত হয়। ইহার পর কামস্পৃহা-বিমুক্ত হইয়া সন্ন্যাসী রাজার হস্তে রাণীকে

প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। (অবদান-কল্পলতায় শ্রীসেনাব-দানে জয়প্রভার উপাখ্যান দ্রষ্টব্য)।

একদা এক জন সাধ্বী রমণী পীড়িত স্বামীর সেবা করিবার জন্য বনে তাহার অনুগমন করে। স্বামীর জন্য বনের ভিতর হইতে ফল সংগ্রহ করিয়া সে যখন কুটীরে ফিরিতেছিল তখন একটি প্রেতের হস্তে পতিত হইল। প্রেত রমণীটিকে ডাকিয়া কহিল, "আমার আদেশ যদি পালন না কব তবে তোমার প্রাণ বধ করিব।" স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, "আমি যে ঘৃণিত প্রেতের হস্তে পতিত হইয়াছি তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আমার দুঃখ স্বামীর প্রতি আমার যে প্রেম সেই প্রেম হইতেই আমি বঞ্চিত হইব।" (Fausboll, Jataka, V. p. 88, কক্কটা-জাতক সং ২৬৭ তুলনীয়)

এরূপ কথা কেবলমাত্র সেই সব নারীই উচ্চারণ করিতে পারে যাহারা দেহে-মনে পবিত্র এবং স্বামীর প্রতি যাহাদের যথার্থ অনুরাগ আছে।

দীঘ-নিকায় গ্রন্থের মহা সুদস্সন সুত্তন্তে ভগবান বুদ্ধ নিজে আদর্শ রমণীর বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

স্ত্রীরত্ন

তিনি বলিয়াছেন—যে নারী সুদর্শনা, স্ত্রীমন্ত, যাহার ব্যবহার চিত্তসুখকর, যাহার দেহের বর্ণ অত্যন্ত সুন্দর; যে খুব দীর্ঘও নয় এবং খুব খর্ব্বও নয়, অত্যন্ত কৃশও নয়, অত্যন্ত স্থূলও নয়, অত্যন্ত ম্লানও নয়, অত্যন্ত উজ্জ্বলও নয়, এবং যাহার নারীসুলভ সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া

দিব্যকান্তি বিরাজমান সেই নারীই "ইত্থিরত্ন' অর্থাৎ স্ত্রীরত্ন। (Diga Nikaya, Vol, II, p. 175) সংস্কৃত মহাযান গ্রন্থ—ললিতবিস্তরেও 'স্ত্রীরত্ন' সম্পর্কে এই একই রকমের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, নারী দেখিতে ক্ষত্রিয় নারীর অনুরূপ, যে অতি দীর্ঘও নহে অতি খর্ব্বও নহে, অতি স্থূলও নহে, অতি কৃশও নহে, অতি উজ্জ্বলও নহে, অতি ম্লানও নহে, যাহার ব্যবহার মধুর, অমায়িক, সুন্দর, যাহার ত্বকের ছিদ্রপথ হইতে চন্দনগন্ধ নির্গত হয়, এবং যাহার মুখ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হয় সেই 'স্ত্রীরত্ন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (ললিতবিস্তর, পৃঃ ১৭)

বিভিন্ন রকমের স্ত্রী

বৌদ্ধসাহিত্যে বিভিন্ন ধরণের স্ত্রীর বর্ণনা আছে। সাত রকমের স্ত্রীর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) যে স্ত্রী হত্যা করে।

(২) যে স্ত্রী চুরী করে।

(৩) যে স্ত্রী স্বামীর উপর প্রভুত্ব করে।

(৪) যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি মাতার ন্যায় স্নেহপরায়ণ।

(৫) যে স্ত্রী ভগিনী যেমন ভ্রাতাকে ভালবাসে স্বামীকে তেমনি করিয়া ভালবাসে।

(৬) যে স্ত্রী নারী-বন্ধুর ন্যায়।

(৭) যে স্ত্রী পরিচারিকার ন্যায়।

আরও সাত রকমের নারী আছে তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) যে স্ত্রী সর্ব্বদা কোপনস্বভাব, রোষপরায়ণ, যে স্বামীর অমঙ্গল কামনা করে, যে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত, যে স্বামীর ধার ধারে না, যে সুযোগ পাইলেই স্বামীকে হত্যা করিতে প্রস্তুত।

(২) যে স্ত্রী স্বামীর উপার্জ্জনের অর্থ অপহরণ করে।

(৩) যে স্ত্রী অলস, কাজে মন দেয় না, কর্কশ-ভাষী, কোপনস্বভাব, যে রুক্ষ কথা প্রয়োগ করে, যে পরিবারস্থ সকল লোকের উপর এমন কি স্বামীর উপরেও প্রভুত্ব করিতে চায়।

(৪) যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি মাতার ন্যায় স্নেহশীল, সর্ব্বদা স্বামীকে বিপদ হইতে রক্ষা করে এবং স্বামীর উপার্জ্জনলব্ধ অর্থ নষ্ট হইতে দেয় না।

(৫) বড় বোন ছোট বোনের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে যে স্ত্রী স্বামীব প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করে, যে সর্ব্বদা লজ্জাশীলা, যে স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী।

(৬) একজন নারী বহুদিন পরে তাহার বন্ধুকে দেখিলে যেমন আনন্দ পায়, যে স্ত্রী স্বামীকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দ অনুভব করে, যে পারিবারিক প্রথাকে পালন করিয়া চলে।

(৭) যে স্ত্রী জীবনের কোনও অবস্থায়, এমন কি স্বামীর দ্বারা প্রহৃত বা উৎপীড়িত হইলেও রাগ করে না, যাহার প্রেমপ্রবণ হৃদয় স্বামীকে সর্ব্বদা ক্ষমা করে, এবং দাসী যেমন স্বামীর অনুগত তেমনই ভাবে স্বামীর অনুগত (Anguttara Nikaya, IV. p.p. 93 93).

সুজাত-জাতকে (নং ২৬৯) বুদ্ধ স্ত্রীকে নিম্নলিখিত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

(১) যে স্ত্রী মন্দ-চিত্ত, ভাল লোকের প্রতি নির্দ্দয়, যে স্বামীকে ঘৃণা করে, এবং অন্য পুরুষকে ভালবাসে, স্বামীর অর্থ লব্ধ সমস্ত জিনিষকেই যে নষ্ট করে। এইরূপ স্ত্রীকে ধ্বংসকারিণী স্ত্রীরূপে অভিহিত করা যায়।

(২) স্বামী বাণিজ্যের দ্বারা বা কোনও নিপুণ ব্যবসার দ্বারা বা কৃষি কার্য্যের দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করে যে স্ত্রী তাহা হইতে কিছু না কিছু চুরী করে। এরূপ নারীকে তস্কর বণিতা আখ্যা দেওয়া যায়।

(৩) যে স্ত্রী অলস, কামুক, লোভী, মন্দভাষিণী, রাগী এবং বিদ্বেষপূর্ণা, আশ্রিতদের প্রতি অত্যাচার-পরায়ণা। এই সব স্ত্রীকে গর্ব্বিতা ও প্রবলা স্ত্রী বলা যায়।

(৪) যে স্ত্রী সজ্জনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না, স্বামীর প্রতি মাতার ন্যায় স্নেহশীল এবং স্বামী যাহা গৃহে আনেন, তাহা যত্নের সহিত রক্ষা করে। এই সব স্ত্রীকে 'মাতৃরূপা স্ত্রী' আখ্যা দেওয়া যায়।

(৫) যে স্ত্রী নম্র, স্বামীর ইচ্ছানুবর্ত্তিনী, এবং ছোট বোন বড় বোনকে যেমন শ্রদ্ধা করে স্বামীর প্রতি সেইরূপ শ্রদ্ধাশীলা। এরূপ স্ত্রীকে 'ভগ্নীরূপী' স্ত্রী বলা হয়।

(৬) যে স্ত্রী ধর্ম্মশীলা, উচ্চবংশোদ্ভবা, দীর্ঘ-বিচ্ছেদের পর বন্ধুকে দেখিলে যেরূপ আনন্দ পায়, যে স্ত্রী স্বামীকে দেখিলে সেইরূপ আনন্দ পায়, যে

স্বামীর উপর নির্ভর-‘পরায়ণা’। এরূপ নারীকে বন্ধু-স্বরূপা’ স্ত্রীরূপে অভিহিত করা যায়।

(৭) যে স্ত্রী সহিষ্ণু, আবেগপূর্ণা, বিবেক-বাণী চালিতা, অপমানে অনুদ্বিজিতা, যে অত্যাচারকে ভয় করে এবং যে স্বামীর ইচ্ছার বশীভূতা। এরূপ স্ত্রীকে ‘ক্রীতদাসীরূপা স্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।’

উভয় বংশের আত্মীয় স্বজনকে অতিথি সৎকারের দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া, স্বামীর প্রতি বিশ্বাস পালন করিয়া, স্বামী যে সমস্ত জিনিষ গৃহে আনয়ন করেন তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া এবং নিজের কর্ম্মনৈপুণ্য শ্রম-শীলতার পবিচর দিয়া নারী তাহার কর্ত্তব্য পালন করিবে। (Dialogues of the Buddha, III, 182) অঙ্গুত্তর-নিকায় গ্রন্থে কতগুলি গুণের উল্লেখ আছে যাহার দ্বারা সমস্ত রমণীরই ভূষিত হওয়া সঙ্গত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইয়াছে নারী স্বামীর অনুগত হইবে, তাহার সহিত মিষ্ট ভাষায় কথা কহিবে, তাহার অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিবে। স্বামীর গুরুজন যেমন শ্বশুর, শাশুড়ী, শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, অতিথিকে আদর-আপ্যায়ন করিবে এবং তাহাদের সুখ ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, সূতাকাটা এবং বস্ত্রবয়নে তাহার দক্ষতা থাকিবে এবং গৃহকার্য্যসম্পাদনে আলস্য করিবে না। গৃহকার্য্য সুচারুভাবে সম্পাদন করিবার উপায় সমূহ তাহাকে উদ্ভাবন করিতে হইবে, তাহার ভিতর গৃহকার্য্য পরিচালনার উপযোগী তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাব হইলে চলিবে না, ভৃত্যদের কাজের উপরে তাহার নজর

গৃহস্থ রমণীব কর্ত্তব্য সমূহ

রাখিতে হইবে, তাহারা পীড়িত হইলে তাহাদের সেবার এবং পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ যাহাতে নষ্ট না হয় সে দিকে তাহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে; সে স্বামীর অর্থ অপহরণ করিবে না, স্বামীকে বঞ্চনা করিবে না, মদ্যপানে বা অন্য কোনও রূপ খারাপ কাজে অর্থ নষ্ট করিবে না, ত্রি-রত্নে সে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, পঞ্চ উপদেশ পালন করিয়া চলিবে, সহৃদয়া হইবে, দাতা হইবে এবং কৃপণ হইবে না। (A.N. IV. pp. 268-269) ধম্মপদত্থকথায় দেখিতে পাওয়া যায়, জল আনা, ধান ভানা এবং রান্না করা (৩য় খণ্ড পৃঃ ৪১) গৃহস্থ রমণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমূহের ভিতর পরিগণিত।

পরলোকে নারীর কল্যাণের জন্য চারিটি গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। (পরলোকবিজয়ায় পটিপন্নো হোতি) (A. N, IV. p. 270).

১। গৃহকর্ম্মে নৈপুণ্য—স্ত্রীলোক অলস হইবে না। পশম ও তুলা হইতে সূতা কাটায় ও বস্ত্রবয়নে তাহার দক্ষতা থাকা চাই। গৃহের বিভিন্ন কর্ত্তব্য পালনের সময় সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান থাকা চাই।

২। পরিবারের লোকদের সুখস্বাচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখার যোগ্যতা :—স্বামীর দাস, দাসী ও অন্যান্য পরিচারকদিগকে সে আদর যত্ন করিবে। তাহারা যথাযথভাবে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে কি না সেদিকে তাহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাহারা পীড়িত হইলে সে তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবে। সে তাহাদিগকে উপযুক্ত খাদ্য দান করিবে।

৩। স্বামীর মনোমত প্রত্যেক কার্য্য করিবার যোগ্যতা ঃ—স্বামীর অমনোনীত কার্য্যে সে প্রাণপণে বিরত থাকিবে।

৪। মিতব্যয়িতা ঃ—সে স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ, সুবর্ণ, রৌপ্য, শস্য ইত্যাদি সঞ্চয় করিবে। সে ঐগুলি চুরি করিবে না, মদ্যপান, জুয়াখেলা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঐগুলি ব্যয় করিবে না।

যে নারী এই সকল গুণে বিভূষিতা, বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, নিয়মিতরূপে শীলানুষ্ঠান করিয়া থাকে, দানশীলা এবং বিদুষী সে পরলোকে সুখী হইবে (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬৯-২৭১)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৌদ্ধযুগে স্ত্রীশিক্ষা

যে সকল রমণী বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিতা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ বেশ বুঝিতে পারিতেন, একেবারে অশিক্ষিতা ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধযুগের অনেক রমণী শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহাদের পুরুষ-ভ্রাতাদেরই সমকক্ষ ছিলেন। অবিবাহিতা বালিকাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়া হইত কিংবা গৃহেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সে কথার কোনও ইঙ্গিত অবশ্য বৌদ্ধ-সাহিত্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু শিক্ষিতা নারীর উল্লেখ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। পালিধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের মতে থেরীগাথার শ্লোকগুলি ঋষিকল্পা নারীদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। নারীদের প্রতিভার প্রমাণ-স্বরূপ সুক্কার ধর্ম্মবক্তৃতা এবং ক্ষেমা ও ধম্মদিন্নার দার্শনিক আলোচনা প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়; সুতরাং সে যুগের নারীদের ভিতর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না এ কথা বলিলে বৌদ্ধ-সাহিত্যে যে-সব ঐতিহাসিক সত্য আছে, তাহাই উপেক্ষা করা হয়। প্রাচীন ভারতের পাণ্ডিত্যের জন্য যেসব রমণী খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের দুই চারি জনের নাম ইউরোপীয়দের না হউক্ অন্ততঃ বহু ভারতবাসীর স্মৃতিপথে এখনও জাগিয়া আছে। থেরীগাথা যাঁহারা গান করিতেন,

তাঁহারই যে ঐ গাথাগুলি রচনা করিয়াছিলেন, এ সমন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ দেখা যায়, কিন্তু বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদের যুক্তি অতি সামান্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যত দিন পর্য্যন্ত না তাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখাইতে পারিতেছেন, তত দিন তাঁহাদের এ কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও সার্থকতা দেখা যায় না। বস্তুতঃ ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয় যে, বুদ্ধের সময়ে যাঁহারা সাংসারিক জীবন পরিহারপূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় আনন্দের রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন, বহু সময়ে বিশেষভাবে মার যখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ইন্দ্রিয়-লালসার লোভ বা নানাবিধ বিভীষিকা দ্বারা তাঁহাদিগকে বিপথগামী করিত, তখন তাঁহারই মুখে মুখে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবময় শ্লোক সকল রচনা করিয়া গান করিতেন। গাথাগুলি যে মেয়েদের দ্বারাই গীত হইত, তাহা নিঃসংশয়েই বলা যায়। তাহা ছাড়া যে সমস্ত রমণী শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের কয়েক জনের বিবরণও প্রদত্ত হইল। বুদ্ধের সময় মেয়েদের ভিতর শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা এই দৃষ্টান্তগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়।

বক্তৃতা করিতে পারিতেন এমন একটি রমণীর উল্লেখ সংযুক্তনিকায় গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুক্কা নাম্নী এক জন ভিক্ষুণী রাজগৃহের এক বৃহৎ জনতার সম্মুখে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এক জন যক্ষ এতই প্রীতি লাভ করিয়াছিল যে রাজগৃহের রাস্তায় রাস্তায় সে বলিয়া ফিরিতেছিল— সুক্কা সুধা বিতরণ করিতেছেন, যাঁহারা বুদ্ধিমান্

তাঁহাদের সেই সুধা পান করিয়া আসা উচিত (১ম খণ্ড, পৃঃ ২১২—২১৩)। ক্ষেমা বিনয়গ্রন্থ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, চমৎকার বক্তৃতা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। একদা রাজা পসেনজিৎ তাঁহার নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যুর পর জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় কি না?" তিনি বলিলেন, "ভগবান বুদ্ধ এ কথার কোনও উত্তর দেন নাই।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই কেন?" ভিক্ষুণী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন কাহাকেও কি জানেন যিনি গঙ্গার বালুকা এবং সমুদ্রের জলবিন্দু গণনা করিতে পারেন?" রাজা কহিলেন, "না।" ভিক্ষুণী বলিলেন, "যদি কেহ পঞ্চ খন্ধের আকর্ষণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে তবে সে অসীম অতলস্পর্শ সমুদ্রের আকার ধারণ করে; সুতরাং মৃত্যুর পর এইরূপ জীবের পুনর্জ্জন্ম ধারণার অতীত বস্তু।" এই উত্তর শুনিয়া রাজা পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন (সংযুক্ত-নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪—৩৮০)।

ভদ্দা কুণ্ডলকেশা সংসার ত্যাগ করিয়া নিগণ্ঠ সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। তাহার পর নিগণ্ঠদের ধর্ম্ম-মত অধিগত করিয়া তাঁহাদের সাহচর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তাঁহাদের জ্ঞান-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। তর্কে সারিপুত্ত ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না।

সারিপুত্ত তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন (থেরীগাথা ভাষ্য, পৃঃ ৯৯)।

মজ্‌ঝিম-নিকায় গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনে সুপণ্ডিতা ধম্মদিন্না নাম্নী এক জন শিক্ষিতা মহিলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক দিন ধম্মদিন্নার স্বামী তাঁহাকে সক্কায়দিট্‌ঠি (দেহকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস), সক্কায়নিরোধ (দেহের বিনাশ), অরিয় অট্‌ঠঙ্গিক মগ্‌গো (আর্য্য-অষ্টাঙ্গিকমার্গ) সংখার (সংস্কার), নিরোধসমাপত্তি (ধ্যানের একটি স্তর যাহাতে কায়-মন-বাক্যের সংস্কারের বিনাশ সাধিত হয়), নিরোধসমাপত্তি হইতে উত্থানের উপায় এবং নানা প্রকার বেদনা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন করেন। ধম্মদিন্না প্রত্যেক প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'পঞ্চ উপাদানখন্ধের দ্বারা সক্কায় (দেহ) নির্ম্মিত। তৃষ্ণাব অর্থ সক্কায়সমুদয়। তৃষ্ণাধ্বংসের অর্থ সক্কায় বিনাশ, মহান্ আট্‌টি পথের দ্বারা সক্কায়-নিরোধ লাভ করা যায়। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই পঞ্চ উপাদানখন্ধকে একত্রে এবং পৃথকভাবে অত্তা (আত্মা) বলিয়া দেখে। জ্ঞানী শিষ্যেরা বাক্য, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এবং মনের কার্য্যকে এইরূপ ভাবে গ্রহণ করেন না। বেদনা তিন প্রকারের—যথা "সুখ, দুঃখ এবং অদুঃখ-অসুখ" (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯ হইতে)। ধম্মদিন্না বিনয়গ্রন্থ বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন (দীপবংস ১৮ পর্ব্ব)।

বিমানবত্থু ভাষ্যে (পৃঃ ১৩১) একটিমাত্র শিক্ষিতা রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রমণীটি শ্রাবস্তীর জনৈক উপাসকের কন্যা—তাঁহার নাম ছিল লতা। তিনি শিক্ষিতা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। সঙ্ঘমিত্তা

ত্রিবিধ বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন। যাদুবিদ্যাতে তাঁহাব বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল (দীপবংস, ১৫ পর্ব্ব)। বিনয় পিটক তিনি এরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, অন্যলোককে এই শাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে পারিতেন। বস্তুতঃ অনুরাধপুবে বিনয় পিটক, সুত্ত পিটকের পাঁচ খানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাত খানি গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন (দীপবংস, ১৮ পর্ব্ব)। অঞ্জলি ছয়টি অলৌকিক গুণ এবং মহান দৈবশক্তির অধিকাবিণী ছিলেন। সঙ্ঘমিত্তার মত তাঁহারও বিনয় পিটকে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনিও অন্য লোকদিগকে এই গ্রন্থ হইতে শিক্ষা দান করিতে পারিতেন। তিনি অনুবাধপুবে ১৬ হাজাব ভিক্ষুণীসহ গমন করিয়াছিলেন এবং বিনয় পিটক হইতে সত্যসত্যই শিক্ষাও দান করিয়াছিলেন। উত্তবা ত্রিবিধ বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং যাদুবিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁহাব গভীব জ্ঞান ছিল। তিনি প্রচুর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনুরাধপুরে গমন করিয়া তিনি বিনয় পিটক, সুত্ত পিটকের পাঁচ খানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাত খানি গ্রন্থের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। কালি এক জন দুশ্চরিত্রের কন্যা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের মন অত্যন্ত পবিত্র ছিল এবং তিনি সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই সুপণ্ডিতা ছিলেন। তিনিও অনুরাধপুরে বিনয় পিটক সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। যে সব ভিক্ষুণী বিনয় আলোচনার দ্বারা জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সপত্তা, ছন্না, উপালি এবং রেবতীর নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

সীবলা এবং মহারুহা অনুরাধপুরে বিনয় পিটক, সুত্ত পিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাত খানি গ্রন্থের অধ্যাপনা করিতেন। সমুদ্দনাভা অনুরাধপুরে বিনয় পিটক শিক্ষা দান করিয়াছিলেন (দীপবংস, ১৮ পর্ব্ব)। হেমা ত্রিবিধ বিজ্ঞানে পারদর্শিনী ছিলেন এবং অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান ছিল (দীপবংস, ১৫ পর্ব্ব)। তিনি বিনয় পিটক, সুত্ত পিটকের পাঁচ খানি গ্রন্থ এবং অভিধম্মের সাত খানি গ্রন্থ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন (১৮ পর্ব্ব)। অগ্‌গিমিত্তা ত্রিবিধ বিজ্ঞান আয়ত্ত কবিয়াছিলেন এবং অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল (১৫ পর্ব্ব)। চূলনাগা, ধন্না, সোণা মহাতিস্‌সা, চূল-সুমনা এবং মহাসুমনা প্রভৃতি নারীগণ শিক্ষিতা, প্রতিভাসম্পন্না এবং শাস্ত্রজ্ঞা ছিলেন (১৮ পর্ব্ব)। নন্দুত্তরা বিদ্যা এবং শিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন (থেরীগাথা ভাষ্য, পৃঃ ৮৭)। যে সমস্ত ভিক্ষুণী বিনয় পিটক আয়ত্ত করিয়াছিলেন, পটাচারা তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারিণী (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫ এবং দীপবংস, ১৮ সর্গ)। উল্লিখিত থেরীগণ ব্যতীত আরও অনেক রমণীর নাম পাওয়া যায় যাঁহারা তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। উপ্পলবণ্ণা, সোভিতা, ইসিদাসিকা, বিসাখা, সবলা, সঙ্ঘদাসী, এবং নন্দা বিনয় গ্রন্থ বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। থেরী উত্তরা, মল্লা, পব্বতা ফেগ্‌গু, ধম্মদাসী, অগ্‌গিমিত্তা এবং পসাদপালা অনুরাধপুরে বিনয় পিটক ও সুত্ত পিটকের

পাঁচ খানি গ্রন্থ এবং অভিধর্ম্মের সাত খানি গ্রন্থ হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। সধম্মনন্দি, সোমা, গিরিদ্ধি, দাসী, এবং ধম্মা বিনয় গ্রন্থ বেশ ভালরূপেই পাঠ করিয়াছিলেন। সুমনা, মহিলা মহাদেবী, পদুমা এবং হেমাসা অনুরাধপুরে বিনয়পিটক হইতে শিক্ষা দান করিতেন (দীপবংস, ১৮ পর্ব্ব)। দিব্যাবদানে রাত্রিকালে বুদ্ধবচন-পাঠ নিরতা নারী-ছাত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃঃ ৫৩২)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৌতমবুদ্ধ ও রমণীগণ

বুদ্ধের ধর্ম্ম বহু ধনী এবং দরিদ্র, বিবাহিত এবং অবিবাহিত রমণীর উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ধর্ম্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা শ্রেষ্ঠ জন্ম বা সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ লাভের অকাঙ্ক্ষায় সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের বাণী যে অনেক বারবণিতার জীবনের ভিতরও পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল, সে কথার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি।

নারী-সম্প্রদায়ের ভিতর শাক্য পরিবারের মহিলা-রাই সর্ব্ব প্রথমে এই নূতন ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবান্বিতা হন। ইহার একটি স্বাভাবিক কারণও আছে। সম্ভবতঃ শাক্য নারীদের সংখ্যা কম ছিল বলিয়াই বহু-বিবাহ তাহাদের ভিতর আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। এই নিমিত্ত শাক্য রমণীদের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন-চিন্তা শক্তিও সমতলের রমণীদের অপেক্ষা সমধিক ছিল; সুতরাং গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা আত্মার মুক্তি কামনায় সর্ব্ব প্রথমে যে সন্ন্যাসীনীর কঠোর জীবন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

নীতির যাহাতে ব্যতিক্রম না হয় সে জন্য ভগবান বুদ্ধের তীব্র উৎকণ্ঠা ছিল। সঙ্ঘে নারী-দিগকে গ্রহণ করাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু অবশেষে শাক্যরমণীদের আগ্রহই জয়যুক্ত হয়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে নারীদের সঙ্ঘে যোগদানের ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে হইয়াছিল। বুদ্ধের জ্ঞান, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নিহিত সত্য, বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকদের চমৎকার আচার ব্যবহারের পদ্ধতির কথা শাক্যবংশের বহু রমণী, গৃহকর্ত্রী, বধূ এবং কন্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রীতি-নীতি তাঁহাদের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তাঁহারা জন্ম-চক্রের ভয়ে ভীত হইয়াই স্বামী এবং পিতামাতার নিকট সংসার ত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবান তথাগত এবং বৌদ্ধধর্ম্ম-জ্ঞানীদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কঠোর সংযম ও সাধনার দ্বারা তাঁহারা অর্হত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

রমণীগণের উপর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব

গৌতমবুদ্ধের সময় সন্ন্যাসধর্ম্ম রমণীদের নিকট কিরূপভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল তাহার পরিচয় থেরীগাথা এবং তাহার ভাষ্য হইতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বৌদ্ধ রীতিনীতির প্রভাব, বিশেষ ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের আকর্ষণী শক্তি মনের ভিতরে অনুপ্রেরণা জাগাইয়া রমণীদিগকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য করিত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, পারিবারিক এবং সামাজিক দুঃখ-মুক্তির কামনায়, অথবা বিশেষ কোনও অসহ্য অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায় রমণীরা সন্তান, পিতামাতা, স্বামী অথবা প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যকে বিস্মৃত হইয়াও সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিতেন। বহু সন্তানহারা জননী,

বন্ধ্যা-বিধবা, এবং অনুতপ্তা বারবণিতা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আকর্ষণী শক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সংসার পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ, তিরস্কার এবং অনুশোচনার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। যুবতী কন্যারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পণে বিকাইবার অপমান হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এবং চিন্তাশীলা রমণীরা যুগযুগান্তের সংস্কার তাঁহাদের জ্ঞানের বিকাশের পথে যে বাধার পাহাড় গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই বাধার হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করেন। অলস এবং বিলাসী জীবনের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া ধনবান লোকদিগের স্ত্রীর মনে সংসার-ত্যাগের বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং দরিদ্রদের পত্নীরা পারিবারিক অভাবের দুঃখ ও দুশ্চিন্তা সহ্য করিতে না পারিয়াই সেই পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই রূপে সংসারের চিন্তা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে অথবা অন্য কোনও আনন্দময় স্থানে পুনর্জ্জন্মের আশায় রমণীরা তখনকার দিনে ভিক্ষুণী এবং থেরীদের কঠোর জীবন ও ব্রত অবলম্বন করিতেন। ইহারা—ভিক্ষু, থের এবং সাধারণ লোক—সকলেরই গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী-ছিলেন।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম এই সকল ধর্ম্ম-প্রাণা রমণীদের মনে এমন দৃঢ় রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল যে শয়তানের প্রতি-মূর্ত্তি মার সমস্ত রকম পাপের প্রলোভন দেখাইয়াও তাঁহাদিগকে জয় করিতে পারে নাই। ইহারা প্রবৃত্তিকেও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন। সুতরাং লম্পটদের দ্বারা ইহাদের মনে কামলিপ্সা

উদ্রেক করার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। থেরীগাথায় এই সম্পর্কে একটি বীভৎস কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। শুভা নামে এক ভিক্ষুণী ছিলেন। নির্ব্বাণের তৃতীয় স্তরে আরোহণ করার পর তিনি-জীবকের আম্রকুঞ্জের ভিতর ভ্রমণ কালে এক লম্পটের দৃষ্টিপথে পতিত হন। লম্পটটি কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাসনা জানাইয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিলে, তিনি তাহাকে তাঁহার সংসার-ত্যাগের কারণ বুঝাইয়া বলেন এবং পথ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। লম্পট কিন্তু তাঁহার কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার উপর বল-প্রয়োগের চেষ্টা করে। ইহার পর শুভা নিজের একটি চক্ষু উৎপাটন করিয়া লম্পটটির হস্তের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে লম্পটটি বিস্মিত হইয়া শুভার পথ ছাড়িয়া দেয় এবং তাঁহার নিকটে কাতর ভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করে। অতঃপর সেস্থান ত্যাগ করিয়া শুভা তথাগতের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার উপদেশ লাভ করেন। এই শুভা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া শীঘ্রই বিশ্লেষাত্মক জ্ঞানের সহিত অর্হত্ত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন (থেরীগাথা ভাষ্য, পৃঃ ২৪৫ হইতে)।

গৃহস্থ রমণীর উপর বুদ্ধের হিতকর প্রভাবের আরও বহুবিধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোশল রাজের ভগিনী সুমনা শ্রাবস্তীর রাজকুমারী ছিলেন।

গৃহস্থ রমণীর উপর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব

একদা তিনি পাঁচ শত রথ এবং পাঁচ শত রাজকুমারী পরিবৃত হইয়া বুদ্ধদেব সন্দর্শনে গমন করেন।

তিনি বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবান তথাগতের দায়ক অর্থাৎ দানশীল শিষ্য এবং অ-দায়ক অর্থাৎ কৃপণ শিষ্য যখন স্বর্গে গমন করে, তখন তাহাদের ভিতর কোনও পার্থক্য থাকে কি না।" বুদ্ধদেব কহিলেন,—"পার্থক্য থাকে। দায়ক শিষ্য অ-দায়ক শিষ্য অপেক্ষা স্বর্গে দীর্ঘ দিন অবস্থান করে। সৌন্দর্য্য, সুখ, সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিও তাহার বেশী হয়।" সুমনা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যখন তাহারা স্বর্গচ্যুত হইয়া আবার নরদেহ ধারণ করে তখন তাহাদের ভিতর কোনও পার্থক্য থাকে কি?" বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, "এই পৃথিবীতেও দায়ক শিষ্য অ-দায়ক শিষ্য অপেক্ষা দীর্ঘ জীবন, সৌন্দর্য্য, সুখ, সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়।" আবার প্রশ্ন হইল—"উভয়েই যদি ভিক্ষু হয় তখনও কি তাহাদের ভিতর কোনও পার্থক্য থাকে?" তথাগত উত্তর দিলেন,—"কাহারও কাছে কোনও জিনিষ যাচ্ঞা না করিয়াও দায়ক শিষ্যের অ-দায়ক শিষ্য অপেক্ষা চারটি প্রয়োজনীয় অভাব দূর হইবে।" সুমনা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাহাদের উভয়েই যদি অর্হৎ হয় তখনও কি ব্যবধান থাকিবে?" এবার বুদ্ধ কহিলেন,—"না।" সুমনা কহিলেন, "দান করাই স্বর্গে, মর্ত্তে এবং ভিক্ষুদের জীবনেও কল্যাণকর অতএব দান করাই সঙ্গত।" তথাগত তাঁহার কথা অনুমোদন করিয়াছিলেন (অঙ্গুত্তর-নিকায় ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩২-৩৪)। ইহার পর এক দিন বুদ্ধদেব যখন পসেনদিকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেছিলেন সেই সময় সুমনা সেই উপদেশাবলী শ্রবণ

করেন। তিনি সে উপদেশ বিশ্বাস করেন এবং বুদ্ধদেবের আশ্রয় লন ও তাঁহার উপদেশে তাহার চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদয় হয়। পিতামহীর মৃত্যুর পর রাজার সঙ্গে সুমনা বিহারে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি তথাগতের ধর্ম্ম প্রচার শ্রবণ করেন এবং সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। অতঃপর জ্ঞানের পরিপূর্ণতার দ্বারা তিনি অর্হত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের বহিরবয়ব এবং আভ্যন্তরিক অর্থও তাঁহার নিকট সম্যকরূপে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল (থেরীগাথা-ভাষ্য. পৃঃ ২২-২৩; অঙ্গুত্তর-নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩২-৩৪)।

সুজাতা সাকেতর কোনও কোষাধ্যক্ষের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এক দিন তিনি ভগবান তথাগতের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে উপবেশন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহাকে ধর্ম্মের বাহ্যিক রূপ এবং আভ্যন্তরিক অর্থ বুঝাইয়া দেন। ভগবানের বাণী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই সুজাতা পটিসম্ভিদা-সহ (বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের সহিত) অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর ভগবান তথাগতকে প্রণাম করিয়া তিনি গৃহে গমন করেন। সেখানে স্বামী এবং পিতামাতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুজাতা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করিবারও অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন (থেরী-ভাষ্য, পৃঃ ১৩৬-১৩৭)।

এক জন ভিক্ষুণীর ধর্ম্ম প্রচার শুনিয়া বড্ঢমাতা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস এতই গভীর ছিল যে তিনি

তাঁহার একমাত্র পুত্র বড্‌ঢকে আত্মীয়-স্বজনের হস্তে সমর্পণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষু-সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অবিলম্বে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, (থেরী-ভাষ্য, পৃঃ ১৭১-১৭২)।

ভদ্দা শ্রাবস্তীর কিম্বিল নগরের জনৈক গৃহস্থের কন্যা। অন্য একটি গৃহস্থ পুত্র বোহকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ভদ্দার স্বভাব অত্যন্ত সৎ ছিল। সেই জন্য তিনি ভদিত্থি অর্থাৎ ভদ্র মহিলা নামে পরিচিতা ছিলেন। একদা বুদ্ধদেবের দুই জন প্রধান শিষ্য কম্বিল নগবে আগমন করেন এবং রোহক তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করেন। ভদ্দা এবং তাঁহার স্বামী ইঁহাদিগকে ভাল খাদ্য, পানীয় এবং অন্যান্য বহু দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে নানা ভাবে সেবা করেন এবং তাঁহা-দের ধর্ম্মালোচনা শ্রবণ করেন। অতঃপর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি পঞ্চশীল লাভ করিয়াছিলেন। ভদ্দা প্রতি অর্দ্ধমাসের অষ্টমী, চতুর্দ্দশী এবং পঞ্চদশীতে 'উপোসথ' পালন করিতেন (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ১০৯-১১০)।

ধম্মপদত্থকথায় উরুবেলার নিকটবর্ত্তী সেনানিগ্রামের রাজ-কন্যা সুজাতা নাম্নী অন্য একটি রমণীর বিবরণ পাওয়া যায়। যে দিন সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সেই দিন পূর্ব্বাহ্ণে তিনি বুদ্ধদেবকে অন্নমণ্ড দান করিয়া-ছিলেন। তাঁহার পুত্র ছিল না। তাই পুত্র হইলে নেরঞ্জরা নদীর তীরস্থিত নিগ্রোধ বৃক্ষের দেবতাকে পূজা দিতে তিনি প্রতিশ্রুত হন; সুতরাং তিনি

যখন পুত্র প্রসব করিলেন তখন অন্নমণ্ড-সহ নিগ্রোধ বৃক্ষের দেবতাকে পূজা করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধকেই দেবতা মনে করিয়া অন্নমণ্ড দান করিয়াছিলেন (ধম্মপদত্থকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬)।

মুত্তা কোশলের ওঘাতক নামক কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। একটি কুব্জ ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি তাঁহার স্বামীর অনুমতি লইয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। তিনি আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং দিব্যজ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা পটিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরীগাথাভাষ্য, পৃঃ ১৪-১৫)।

শ্রাবস্তীর কোনও পরিবারের এক বধূ এক জন অর্হৎকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল এবং তাহার নিজের আহার্য্য পিষ্টক হইতে কিয়দংশ তাঁহাকে দান করিয়াছিল। থের সেই উপহার গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করেন। এইরূপে সে যে সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছিল তাহারই বলে মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে (বিমানবত্থুভাষ্য, পৃঃ ৬১)।

রাজগৃহের কোনও কোষাধ্যক্ষের ভৃত্যের নাম ছিল পুণ্ণ। একদা মাঠে কাজ করিবার সময় তাহার পত্নী তাহার জন্য অন্ন লইয়া গমন করিতেছিল। পথে তাহার সহিত সারিপুত্তের সাক্ষাৎ হয় এবং আনন্দের সহিত সে সারিপুত্তকে সমস্ত অন্নই দান করে। ঐ উপহার গ্রহণ করিয়া সারিপুত্ত তাহাকে আশীর্ব্বাদের দ্বারা অভিনন্দিত করেন। ইহার পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক

আবার অন্ন প্রস্তুত করিয়া সে মাঠে লইয়া যায় এবং স্বামীর কাছে বিলম্বের হেতু বর্ণনা করে। সমস্ত শুনিয়া পুন্ন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিল। অতঃপর অন্ন ভোজন করিয়া স্ত্রীব কোলে মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়ে; কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিতে পায় যে, সমস্ত মাঠ স্বর্ণে ভরিয়া গিয়াছে। থের সারিপুত্তের প্রভাবই যে এই স্বর্ণলাভের কারণ তাহা বুঝিতে পুন্ন এবং তাহার স্ত্রীর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। তাহারা কিঞ্চিৎ স্বর্ণ লইয়া রাজসমীপে গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিল। রাজা ক্ষেত্র হইতে স্বর্ণগুলি তুলিয়া আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। যে মুহূর্ত্তে স্বর্ণগুলি শকটে তোলা হইল অমনই তাহা মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া গেল। রাজকর্ম্মচারীরা রাজার কাছে এই অদ্ভুত ব্যাপার জ্ঞাপন করিতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সৎকর্ম্মের জন্য কেবল পুন্ন এবং তাহার স্ত্রীকেই পুরস্কৃত করা হইয়াছে এবং তাহারাই উহা ভোগ করিবার প্রকৃত অধিকারী। ইহার পর তিনি পুন্নের জন্যই স্বর্ণগুলি সংগ্রহ করিবার আদেশ করিলেন, স্বর্ণগুলি রাজভাণ্ডারে আনিয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইল। রাজা অতঃপর বহুধন শেট্‌ঠি নাম দিয়া পুন্নকে নগর-শ্রেষ্ঠির পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুন্ন তাহার এই পদলাভের সময় এবং তাহার নূতন প্রাসাদে প্রবেশ কালে বুদ্ধ এবং সঙ্ঘকে অজস্র উপহার দান করিয়াছিল। সৎকার্য্যের দ্বারা পুন্ন এবং তাহার স্ত্রী পরে

নির্ব্বাণের প্রথম সোপানেও আবোহণ করিয়াছিল। (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ৬২-৭৪)

সুপ্পিয়া বারাণসীর কোনও গৃহস্থের পত্নী ছিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। সর্ব্বদা বিহারে গমন করিয়া ভিক্ষুদের অভি-প্রায় অনুসারে কাজ করিতেও তিনি আনন্দানুভব করিতেন। ভিক্ষুদের স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। একদা এক জন ভিক্ষু জোলাপ গ্রহণ করিয়া সুপ্পিয়াকে তাহার ভোজনোপযোগী কোনও মাংস রন্ধন করিয়া দিতে বলেন। তিনি রন্ধন করিয়া দিতে স্বীকৃত হন বটে কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে এরূপ কোন প্রাণী খুঁজিয়া পান না। অতঃপর নিজের উরুদেশ হইতে মাংস কাটিয়া তাহাই রন্ধন করিয়া তিনি ভিক্ষুকে আহার করিতে দিয়াছিলেন। তাহার স্বামী ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রতি পত্নীর এই অপূর্ব্ব নিষ্ঠা দেখিয়া বিস্মিত হন। ইহার পর এক দিন তাঁহারা বুদ্ধদেবকে তাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করনে। ভোজনাবসানে সুপ্পিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুদ্ধদেব জানিতে পারিলেন যে, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। অতি কষ্টে তাঁহাকে তথাগতের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে, তিনি তাঁহাকে তাঁহার আদর্শ ত্যাগের জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহার ক্ষতও সম্পূর্ণ-রূপে আরোগ্য হইয়া গিয়াছিল (বিনয় পিঠক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬-২১৯)।

রাজগৃহে এক ধনী গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা বুদ্ধদেবের গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। এক দিন তাঁহারা যখন পুষ্প এবং গন্ধভার বহন করিয়া বুদ্ধের স্মৃতিপূজার জন্য গমন করিতেছিলেন তখনই গৃহস্বামী আসিয়া তাহাদিগকে গমন করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু এ নিষেধ বাক্য না শুনিয়াই তাহারা তাঁহার পূজার জন্য গমন করিয়াছিলেন এবং পূজা সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পর তাঁহারা দেবলোকে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। (পরমত্থদীপণি পৃঃ ২১২-২১৫)।

অবিশ্বাসী পরিবারে বুদ্ধভক্ত রমণী

শ্রাবস্তীর একটি রমণী পতিব্রতা ছিলেন। তিনি স্বামীর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিতেন না। তাহা ছাড়া তিনি সত্যবাদিনী ও দানশীলা ছিলেন এবং বুদ্ধের উপদেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। সামর্থ্যানুযায়ী দান করা তাঁহার নিয়ম ছিল। মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিমানবত্থু-ভাষ্য পৃঃ ৫৬-৫৭)।

পুণ্ণ রাজগৃহের জনৈক কোষাধ্যক্ষের ভৃত্য ছিলেন। তাঁহার কন্যার নাম ছিল উত্তরা। উত্তরার স্বামী, শ্বশুর এবং শাশুড়ী সকলে মিথ্যা ধর্ম্মের অনুরক্ত ছিলেন। এ কারণ ভিক্ষুকে বা সঙ্ঘে দান করিবার কোনও সুযোগ বা সুবিধা উত্তরার ছিল না। অবশেষে এই অসুবিধার কথা উত্তরা তাঁহার পিতাকে জানান। কন্যার দুঃখের কথা জানিয়া পুণ্ণ কন্যাকে প্রচুর অর্থ

প্রেরণ করেন। উত্তরা এই অর্থের কিয়দংশ স্বামীকে দিয়া আমোদ-প্রমোদে দুই সপ্তাহ কাটাইবার জন্য বারবণিতা সিরিমার হাতে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। ফলে এই দুই সপ্তাহ সমস্ত বাধা হইতে মুক্ত হইয়া উত্তরা বুদ্ধদেব এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে দান করিবার এবং বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। সশিষ্য বুদ্ধদেব তাহার গৃহে আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া উত্তরা নির্ব্বাণের দ্বিতীয় অবস্থা লাভ করেন। সিরিমার সঙ্গে পাঁচ শত গণিকা ছিল। তাহারাও ভগবান তথাগতের বাণী শুনিয়া নির্ব্বাণের প্রথম অবস্থা লাভ করিয়াছিল। ইহার অল্প দিন পরেই উত্তরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিমানবত্থু-ভাষ্য পৃঃ ৬২-৭৪; ধম্মপদত্থকথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২ হইতে তুলনীয়)

রাজগৃহের একটি বালিকা মহামোগ্গল্লানর অনুরক্ত কোনও পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যহ সে ভিক্ষুদিগকে দান করিত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মিথ্যা ধর্ম্ম-বিশ্বাসী কোনও পরিবারের একটী যুবকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। এক দিন মহামোগগল্লান আসিয়া তাহাদের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। বালিকাটি তাঁহাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিল এবং শাশুড়ীর জন্য রক্ষিত পিষ্টক আহারের জন্য প্রদান করিল। শাশুড়ী এই ঘটনা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বালিকাটির স্কন্ধদেশে গুরুতর আঘাত করিয়াছিলেন। ইহার পর

বালিকাটির মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ১২০-১২১)

ভিক্ষুণী সঙ্ঘের উদ্ভব

সমস্ত বৌদ্ধ ইতিহাসেই দেখা যায় যে মহাপজাপতী গোতমী এবং পাঁচ শত শাক্য মহিলাই সর্ব্বপ্রথমে সংসারের মায়া কাটাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপজাপতি গোতমী বুদ্ধের ধাত্রীমাতা; রাজকুলে তাঁহার জন্ম হইলেও রমণীদের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথমে পার্থিব সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করিয়া সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনিই মস্তক মুণ্ডন করেন এবং পীত পরিচ্ছদ পরিধান করেন। এ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—"সে সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুর নিগ্রোধ-আরামে শাক্যদের ভিতর বাস করিতেছিলেন। বুদ্ধদেব যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন সেইখানে গমন করিয়া মহাপজাপতী তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক একপাশে দাঁড়াইলেন এবং দাঁড়াইয়া থাকিয়াই কহিলেন, "প্রভু, রমণীদিগকেও গৃহ ত্যাগ করিয়া তথাগতের প্রচারিত নিয়ম ও ধর্ম্মানুসারে সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে অনুমতি দান করুন, তাহাতেই তাহাদের কল্যাণ হইবে।" ভগবান বুদ্ধদেব কহিলেন, "গোতমী, তুমি যথেষ্ট বলিয়াছ। স্ত্রীলোকেরা এরূপ করিবার অনুমতি পাইলে তাহাতে তোমার আনন্দিত হওয়া সঙ্গত নহে।" দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার মহাপজাপতী গোতমী তাঁহার নিকট একই অনুরোধ করিলেন এবং তাহাতে বুদ্ধদেব সেই একই উত্তর করিলেন।

অতঃপর মহাপজাপতী গোতমী বুদ্ধদেবের নিকট হইতে নারীদের সন্ন্যাস-গ্রহণের অনুমতি না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া তিনি গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নেত্রদ্বয় বাষ্পভারাকুল ছিল।

যত দিন কপিলাবস্তুতে থাকা সঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছিল তত দিন সেখানে অবস্থান করিয়া ভগবান বুদ্ধদেব বৈশালীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথা সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মহাবনের ভিতর কুটাগার গৃহে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে মহাপজাপতী গোতমীও মস্তক মুণ্ডন করিয়া, কমলালেবুর রংএর পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক কতকগুলি শাক্য রমণী-সমভিব্যাহারে বৈশালী অভি-মুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময়ে বৈশালীর মহাবনের ভিতর কুটাগার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া মহাপজাপতী গোতমী স্ফীতপদে, ধূলি-ধূসরিত দেহে, বিষণ্ণ ও শোকাকুল মনে এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রবেশদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পূজ্যপাদ আনন্দ মহাপজাপতীকে সেইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন, "মহাপজাপতী আপনি স্ফীতপদে, ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় বিষণ্ণ ও শোকাকুল মনে এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে তোরণ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন কেন?" মহাপজাপতী উত্তরে কহিলেন, "আনন্দ, ভগবান তথাগত রমণীদিগকে গৃহ-ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রচারিত নিয়ম ও ধর্ম্মানুসারে

সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে অনুমতি দান করেন নাই বলিয়া আমরা এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছি।”

অতঃপর পূজ্যপাদ আনন্দ ভগবান বুদ্ধদেব যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন সেখানে গমন করিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন এবং আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন—“প্রভু, মহাপজাপতী গোতমী তোরণ বাহিরে স্ফীতপদে, ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় বিষণ্ণ মনে এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে দাঁড়াইয়া আছেন। তথাগতের প্রচারিত নিয়ম ও ধর্ম্ম অনুসারে সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অনুমতি প্রদান না করার জন্য এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। রমণীরা যেরূপ কামনা করিতেছেন তদনু-সারে তাঁহাদিগকে কাজ কবিবার অনুমতি দান করুন।” ভগবান বুদ্ধদেব কহিলেন, “আনন্দ তুমি যথেষ্ট বলিয়াছ। রমণীদিগকে সেরূপ অনুমতি দান করা সঙ্গত হইবে না।” দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার আনন্দ সেই একই অনুবোধ করিয়া ভগবান তথাগতের নিকট হইতে সেই একই উত্তর লাভ করিলেন।

অতঃপর পূজ্যপাদ আনন্দ মনে, মনে কহিলেন,—ভগবান বুদ্ধদেব যখন অনুমতি প্রদান করিলেন না তখন, অন্য কোন যুক্তির দ্বারা তাঁহার অনুমোদন লাভের চেষ্টা করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি কহিলেন,—“প্রভু, সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভগবান তথাগতের প্রচারিত নিয়ম ও অনুশাসন পালন পূর্ব্বক রমণীরা যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে তবে কি তাহারা কথোপকথনের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অথবা নির্ব্বাণের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সোপানে

আরোহণ করিতে অথবা অর্হত্ত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে না?" বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, "সে শক্তি তাহাদের আছে।" আনন্দ কহিলেন, "তাহা যদি হয়, তবে হে প্রভু যেহেতু মহাপজাপতী গোতমী পিতৃব্য-পত্নী এবং ধাত্রীরূপে ভগবান বুদ্ধের বাল্যকালে তাঁহাকে সেবা করিয়াছেন, দুগ্ধ পান করাইয়াছেন এবং মাতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে বক্ষঃস্তন্যে বর্দ্ধিত করিয়াছেন সেই হেতু স্ত্রীলোককে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তথাগতের নিয়ম ও অনুশাসন পালন পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অনুমতি দান করুন।"

ভগবান বুদ্ধদেব কহিলেন, "এরূপ ক্ষেত্রে হে আনন্দ মহাপজাপতী গোতমী যদি প্রধান আট্‌টী অনুশাসন পালনের প্রতিশ্রুতি দান করেন, তবে সেই প্রতিশ্রুতি দ্বারাই তিনি দীক্ষিত হইয়াছেন—এরূপ মনে করা যাইতে পারে।"

অতঃপর পূজ্যপাদ আনন্দ ভগবান তথাগতের নিকট হইতে আট্‌টি অনুশাসন অবগত হইয়া মহা-পজাপতীর নিকট গমন করিলেন এবং ভগবান বুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন।

পজাপতী গোতমী সব শুনিয়া কহিলেন, 'আনন্দ, তরুণ বয়সে যখন পুরুষ অথবা রমণীর দেহের প্রসাধনের প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন স্নানের পর পদ্মের মাল্য অথবা মল্লিকা ফুলের মাল্য, অথবা অতিমুক্তক ফুলের মাল্য পাইলে যেমন উভয় হস্তে গ্রহণ করিয়া মস্তকে স্থাপন করে, আমিও সেইরূপ ভাবে এই আট্‌টি অনু-

শাসন গ্রহণ করিলাম; জীবনে আমি কখনও এগুলি লঙ্ঘন করিব না।

ইহার পর পূজ্যপাদ আনন্দ ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং সেইরূপ অবস্থায় থাকিয়াই কহিলেন "প্রভু, মহাপজাপতী গোতমী প্রধান আটটী অনুশাসন-পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন,--ভগবান তথাগতের পিতৃব্য পত্নী উপসম্পদা লাভ করিয়াছেন।" (S.B E. প্রকাশিত বিনয়-পিঠক ২য় খণ্ড ৩য় ভাগ পৃঃ ৩২০, মনোবথপূবণী, সিংহলী সংস্করণ পৃঃ ২০৩ তুলনীয়)

ইহাব পব মহাপজাপতী গোতমী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং যে পাঁচশত শাক্য রমণী তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও দীক্ষালাভ করেন। এইরূপে দীক্ষিত হইয়া মহাপজাপতী ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে গমন করিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। ভগবান তথাগত তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। অতঃপর নিয়মানুবর্ত্তিতার দ্বারা তিনি শীঘ্রই প্রাথমিক এবং বিশ্লেষাত্মক জ্ঞানের সহিত অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অন্য পাঁচ শত ভিক্ষুণী নন্দকের উপদেশ শ্রবণ করার পর (মঝ্‌ঝিম নিকায় তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭০ হইতে) ছয়টী শাখার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জ্জন করেন। (থেরীগাথা-ভাষ্য ১০০ পৃঃ হইতে তুলনীয়)

এই পাঁচ শত শাক্য মহিলা ভিন্ন তিস্‌সা, ধীরা নাম্নী দুই জন, মিত্তা, ভদ্দা, এবং উপসমা প্রভৃতি অন্তঃপুরের কয়েকজন রমণীও মহাপজাপতী গোতমীর

সহিত সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। যথা-সময়ে তাঁহারাও অর্হত্ত্ব লাভ করেন। (থেরীগাথা-ভাষ্য পৃঃ ১২-১৩)

ভদ্দা কচ্চানা সুপ্পবুদ্ধ নামক এক জন শাক্যের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ত্বকের বর্ণ সোণার মত ছিল বলিয়াই তাঁহাকে এই নাম দেওয়া হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গৌতম বুদ্ধ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহাদের যে পুত্র হইয়াছিল তাহারই নাম রাহুল। এই পুত্রের জন্মদিবসেই বুদ্ধ সংসার পরিত্যাগ করেন এবং তাহার পর সিদ্ধিলাভ করিয়া কপিলাবস্তুতে ফিরিয়া আসেন ও তাঁহার নিজের জ্ঞাতি-গোষ্ঠিদের ভিতরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর ভদ্দা মহাপজাপতী গোতমীর নিকট গমন করিয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি ভদ্দা কচ্চানা নামে খ্যাতি লাভ করেন। যথাকালে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির পূর্ণতা লাভ করিয়া তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত ভিক্ষুণী অসাধারণ দৈবশক্তির অধিকারিণী ছিলেন, তাঁহাদের ভিতরেও ভদ্দাকে অতি উচ্চ স্থান দেওয়া হয়। (মনোরথ-পুরণী, পৃঃ ২২৪-২২৫; অঙ্গুত্তর নিকায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫)

মহাপজাপতী গোতমী এবং আরও কতকগুলি শাক্য মহিলার অভিষেকের পরেই ভিক্ষুণীসঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহা বহুগ্রামে, সহরে এবং জেলাতে ছড়াইয়া পড়ে।

সঙ্ঘে প্রবেশের পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার অপ-

রাধের দণ্ড হইতে থেরী এবং ভিক্ষুণীরা মুক্ত ছিলেন। একদা এক জন লিচ্ছবির পত্নী ব্যভিচার করে। স্বামী তাহাকে হত্যা করিতে মনস্থ করেন। এজন্য রমণীটি শ্রাবস্ত্রীতে গমন করিয়া জনৈক ভিক্ষুণীর দ্বারা দীক্ষিত হন। স্বামী শ্রাবস্ত্রীতে আসিয়া তাহাকে দীক্ষিত দেখিয়া কোশলের রাজা পসেনদির কাছে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে যে ভিক্ষুণী হইয়াছে তাহাও রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া রাজা বলিলেন "সে যখন ভিক্ষুণী হইয়াছে, তখন তাহাকে আর কোনও দণ্ডেই দণ্ডিত করা সম্ভব নহে।" (ভিক্ষুণীবিভঙ্গ, সঙ্ঘাদিসেস ২য় খণ্ড পৃঃ ২২৫) যে নারী স্বামীর শয্যাকে কলুষিত করিয়াছে তাহার দণ্ড অত্যন্ত কঠোর ছিল। স্বামী অনায়াসেই তাঁহার জীবন গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু প্রবজ্যা গ্রহণের দ্বারা ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেই ব্যভিচারিণী রমণীরাও দণ্ডের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিত। (ওল্ডেনবার্গের বিনয়-পিটক, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২২৫-২২৬)

সঙ্ঘপ্রবেশের অনুশাসন

আটটি অনুশাসন পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়া রমণীরা সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকার লাভ করিতেন। অনুশাসন কয়েকটি এইরূপ—

(১) ভিক্ষুণীর বয়স যদি এক শত বৎসরও হয় তাহা হইলেও তাকে এক জন তরুণ ভিক্ষুর আরাধনা করিতে হইবে।

(২) কোনও ভিক্ষুর বাসস্থানের সম্মুখে ভিক্ষুণী তাহার বর্ষাবাসের কাল যাপন করিবে না।

(৩) ভিক্ষুণীকে মাসে দুইবার করিয়া ভিক্ষুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) উপবাসের অবসানে যে অপরাধ দৃষ্ট, শ্রুত বা কল্পিত হইয়াছে তাহার জন্য ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ এই উভয়ের কাছেই ভিক্ষুণীকে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে হইবে।

(৫) যদি কোনও গুরুতর অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ভিক্ষুণীকে উভয় সঙ্ঘের কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে।

(৬) দুই বৎসর ধরিয়া ছয়টি উপদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া ভিক্ষুণী উভয় সঙ্ঘের কাছে উপসম্পদা যাচ্ঞা করিবে।

(৭) ভিক্ষুণী কোনও ভিক্ষুকে অপমান করিবে না। বা তাহার নিন্দা করিবে না।

(৮) কোনও ভিক্ষুণী কোনও ভিক্ষুর সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিবে না, কিন্তু ভিক্ষু ভিক্ষুণীকে উপদেশ দিতে পারিবে। (বিনয়-পিঠক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৩-২৫৫)

ভিক্ষুণীসঙ্ঘ পরিচালনের নিয়মাবলী

ভিক্ষুণীসঙ্ঘের কতকগুলি অনুশাসনকে ভিক্ষুণীদের পালন করিয়া চলিতে হইত। এই অনুশাসনগুলি পালনে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল। অনুশাসন গুলি এইরূপ :—

(১) একটি বিহারে ভিক্ষুণী এক পাত্রের বেশী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

(২) কোনও জিনিষের বিনিময়ে কোনও

উপাসক বা উপাসিকার নিকট হইতে কোনও ভিক্ষুণী কোনও দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৩) যে উদ্দেশ্যে কোন জিনিষ কোন ভিক্ষুণীকে দেওয়া হইবে, সে জিনিষ সেই উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পাবিবে না।

(৪) কোনও লোকেব দ্বাবা অনুরুদ্ধ হইয়াও ভিক্ষুণী এমন কোনও জিনিষ যাচ্ঞা করিতে পারিবে না যাহার মূল্য ১৬ কহাপণের বেশী।

(৫) ভিক্ষুণী শ্বেত পলাণ্ডু ভক্ষণ করিবে না।

(৬) ভিক্ষুণী ধান্য গ্রহণ কবিবে না।

(৭) ভিক্ষুণী জানালাব ভিতর দিয়া রাস্তায় অথবা ক্ষেত্রে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিবে না।

(৮) ভিক্ষুণী নৃত্য, গীত বাদ্যে যোগদান কবিবে না।

(৯) কোনও লোকের সহিত অন্ধকারে একাকী কোনও ভিক্ষুণী বাক্যালাপ করিবে না।

(১০) আচ্ছাদিত স্থানে লোকের সঙ্গে একত্রে উপবেশন বা কথোপকথন করিতে পারিবে।

(১১) অন্য লোকের অসাক্ষাতে চন্দ্রালোকিত ময়দানে বসিয়াও কোন পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ।

(১২) কোনও প্রকাশ্য রাস্তায় বা চৌমাথায় যেখানে বায়সেরা থাকে সেখানে একাকী দাঁড়াইয়া সে কোনও লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে না।

(১৩) যে গৃহে সে প্রত্যহ ভোজন করে সেই গৃহকর্ত্তার অনুমতি ব্যতীত সে অন্যত্র গমন করিবে না।

(১৪) গৃহকর্ত্তার অনুমতি না লইয়া অপরাহ্নে কোনও গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সে উপবেশন বা শয়ন করিবে না।

(১৫) সে কোনও ব্যক্তিকে অভিশাপ করিবে না।

(১৬) নগ্ন হইয়া সে কখনও স্নান করিবে না।

(১৭) দুই জন ভিক্ষুণী এক শয্যায় শয়ন করিবে না, অথবা এক বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিবে না।

(১৮) যদি কোনও ভিক্ষুণী পীড়িত হইয়া পড়ে তবে তাহার সঙ্গিনী ভিক্ষুণী, হয় নিজে তাহাকে শুশ্রূষা করিবে, না হয় অন্যের দ্বারা তাহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবে।

(১৯) যদি কোনও ভিক্ষুণী অন্য একটি ভিক্ষুণীকে আশ্রয় দিয়া থাকে তবে তাহাকে সে নিজেও বিতাড়িত করিবে না এবং অন্যে যাহাতে বিতাড়িত করে তাহারও কারণ স্বরূপ হইবে না।

(২০) কোনও গৃহস্থ বা গৃহস্থ পুত্রের সহিত সে মেলামেশা করিবে না।

(২১) চোর, ডাকাত দুশ্চরিত্র লোক হইতে আশঙ্কার সম্ভাবনা থাকিলে সে নিজের দেশে ভ্রমণের সময় অস্ত্র সঙ্গে রাখিবে।

(২২) বর্ষাবাসের সময় সে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিবে না।

(২৩) বর্ষাবাসের পর সে বিহারে অবস্থান করিবে না।

(২৪) ভিক্ষুণী রাজপ্রাসাদ, রাজোদ্যান, চিত্র-

মণ্ডপ, প্রমোদ উদ্যান, সুন্দর উদ্যান, পুষ্প শোভিত সরোবর প্রভৃতি পরিদর্শনে গমন করিবে না।

(২৫) সে মূল্যবান চৌকি বা সুন্দর খট্টা ব্যবহার করিবে না।

(২৬) সে কোনও গৃহস্থকে সেবা করিবে না।

(২৭) সে স্ব-হস্তে কোনও গৃহস্থ, পরিব্রাজক বা পরিব্রাজিকাকে খাদ্য দান করিবে না।

(২৮) অন্য কোনও ভিক্ষুণীকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার না দিয়া সে কখনও তাহার বাসগৃহ পরিত্যাগ করিবে না।

(২৯) জীবিকার্জ্জনের জন্য সে কোনও শিল্পশিক্ষা করিবে না।

(৩০) সে কাহাকেও কোন শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিবে না।

(৩১) যে কুটিরে কোনও ভিক্ষু বাস করে সে কুটিরে তাহার অনুমতি ছাড়া কোনও ভিক্ষুণী প্রবেশ করিবে না।

(৩২) সে কোনও ভিক্ষুর অপমান করিবে না।

(৩৩) অন্য লোকের গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া সে সকলের পূর্ব্বে ভোজন করিবে না।

(৩৪) কোনও বিশেষ পরিবারের সহিত তাহার কোনরূপ সংশ্রব থাকিবে না।

(৩৫) ভিক্ষুশূন্য কুটিরে সে বর্ষাবাস পালন করিবে না।

(৩৬) ভিক্ষুণী ভিক্ষুর নিকটে উপদেশ গ্রহণের জন্য গমন করিবে।

(৩৭) এরূপ কোনও রমণীকে সে শিষ্যারূপে গ্রহণ করিবে না যে সংসার পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাহার পিতামাতার অনুমতি লয় নাই।

(৩৮) শক্তি থাকিতে সে কোনওরূপ যান ব্যবহার করিবে না।

(৩৯) সে অলঙ্কারে দেহ ভূষিত করিবে না বা সুগন্ধি জলে স্নান করিবে না।

(৪০) অনুমতি না লইয়া সে কোনও ভিক্ষুর সম্মুখে আসন গ্রহণ করিবে না।

(৪১) ভিক্ষুর নিকট অনুমতি গ্রহণ না করিয়া সে তাহাকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে না।

(৪২) রাত্রিতে সে একাকী গমন করিতে পারিবে না। (বিনয় পিটক)

(৪৩) ভিক্ষুণীরা পর্য্যায়ক্রমে ভিক্ষুদের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে (মঝ্ জিম-নিকায়, ৩য় খণ্ড ২৭০ পৃঃ) ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীদের জন্য যে সমস্ত সাধারণ উপদেশ আছে সেগুলি তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে; ভিক্ষুণীদের জন্য যে সমস্ত বিশেষ অনুশাসন আছে তাহাও তাহাদিগকে পালন করিতে হইবে। (বিনয়-পিটক, ২য় খণ্ড ২৫৮ পৃঃ)

(৪৪) ভিক্ষুণীরা ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও লোকের দেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। (বিনয় পিঠক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২০-২২২) কামচিন্তা লইয়া কোনও ভিক্ষুকে স্পর্শ করাও তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। (বিনয় পিটক ২১১ পৃঃ)

(৪৫) যে সমস্ত সভায় শ্রমণী বা ভিক্ষুণী থাকিবে সে সমস্ত সভায় পাতিমোক্ষ আবৃত্তি করা

হইবে না। পারণা উৎসবেও পাতিমোক্ষের আবৃত্তি নিষিদ্ধ। (বিনয় পিটক, ১ম খণ্ড, পৃঃ, ১৩০; ঐ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬৭)

(৪৬) ভিক্ষুণীরা অরণ্যে বাস করিবে না, কারণ তাহাতে উপ্পলবণ্ণার যেরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল সেইরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে (ধম্মপদত্থকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮-৫১)। বিনয় পিটকে দেখা যায়, যে পরিচ্ছদ একবার ভিক্ষুণীকে দেওয়া হইয়াছে তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না। (ধম্মপদত্থকথা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৪৭)

ভিক্ষুবা ভিক্ষুণীকে নমস্কার করিবে না বা সম্মান দেখাইবে না। (বিনয় পিটক, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭-২৫৮)

সঙ্ঘ যে-ভিক্ষুণীকে বর্জ্জন করিয়াছে কোনও ভিক্ষুণী তাহাকে সাহায্য কবিতে পারিবে না।

অনুশাসন লঙ্ঘন

যে ভিক্ষুণী অন্য কোনও ভিক্ষুণীর পারাজিকা অপরাধ জানিয়া গোপন করিবে, সেও পারাজিকা অপরাধে অপরাধী হইবে।

যে ভিক্ষুকে ভিক্ষু-সঙ্ঘ বর্জ্জন করিয়াছে কোনও ভিক্ষুণী যদি তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলে তবে পারাজিকা অপরাধে অপরাধী হইবে।

কোনও ভিক্ষুণী কোনও গৃহস্থ, গৃহস্থের পুত্র, ক্রীত দাস, কর্ম্মচারী, এমন কি কোনও শ্রমণ অথবা পরিব্রাজকের নামেও অভিযোগ আনয়ন করিতে পারিবে না। যদি করে তবে সে সঙ্ঘাদিদেশ অপরাধে অপরাধী হইবে।

যদি কোনও লোক কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে কোনও ভিক্ষুণীকে উপহার পাঠায়, এবং ভিক্ষুণী যদি তাহার

উদ্দেশ্যের কথা জানিয়াও তাহা গ্রহণ করে, তবে সে সঙ্ঘাদিদেশ অপরাধে অপরাধী হইবে।

সঙ্ঘে নারীদিগকে গ্রহণের ফল সম্বন্ধে বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী

বুদ্ধদেব এই বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে "হে আনন্দ, রমণীরা যদি গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তথাগতের নিয়ম ও অনুশাসন অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি লাভ না করিত, তবে এই পবিত্র ধর্ম্ম দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইত, এই উৎকৃষ্ট অনু-শাসনগুলি হাজার বৎসর পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিত। কিন্তু, আনন্দ, যে হেতু রমণীরা এই অনুমতি লাভ করিয়াছে সেই হেতু এই পবিত্র ধর্ম্ম দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইবে না এবং এই উৎকৃষ্ট অনুশাসনগুলিও পাঁচ শত বৎসর মাত্র চলিবে। হে আনন্দ, যে গৃহে বহু নারী বাস করে সে গৃহ যেমন দস্যু-তস্করের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, ঠিক সেইরূপ যে ধর্ম্ম এবং অনুশাসন অনুসারে নারী সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণের সুবিধা পায় সে ধর্ম্মও দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। হে আনন্দ, উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রও চিতি ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইলে সে ক্ষেত্রও যেমন দীর্ঘ দিন ভালো অবস্থায় থাকে না, ঠিক সেইরূপ যে ধর্ম্মও অনুশাসন অনুসারে নারী গৃহ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণের সুযোগ পায় সে ধর্ম্মও দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইতে পারে না। হে আনন্দ, কোন কোন উৎকৃষ্ট ইক্ষু ক্ষেত্রে ক্ষয় রোগ স্পর্শ করিলে সে ইক্ষুক্ষেত্র যেমন দীর্ঘ দিন টিকিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ যে ধর্ম্ম ও অনুশাসন অনুসারে নারী সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণের সুযোগ পায়

সে ধর্ম্মও দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইতে পারে না। হে আনন্দ, মানুষ যেমন পূর্ব্বেই প্লাবনের আশঙ্কা করিয়া প্রকাণ্ড জলাশয়ের চারিদিকে, জলকে আবদ্ধ রাখিবার জন্য বাঁধ বাঁধিয়া দেয়, আমিও তেমনি পদস্খলনের আশঙ্কা করিয়া ভিক্ষুদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আট্‌টি প্রধান অনুশাসনের নির্দ্দেশ করিতেছি। তাহাদিগকে আজীবন এই অনুশাসনগুলি পালন করিয়া চলিতে হইবে। (বিনয়-পিটক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৫-৩২৬)

বুদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। ভিক্ষুদের সহিত ভিক্ষুণীদের এবং ভিক্ষুণীদের সহিত সাধারণে লোকের অবাধ মেলামেশায়, পরবর্ত্তী কালে যে বহুবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়, থুল্লনন্দা, এবং মল্ল দব্ব, অভিরূপ-নন্দা এবং শ্রাবস্তীর কোষাধ্যক্ষ মিগারের পৌত্র শাঢ়্‌হের আখ্যায়িকাই তাহার প্রমাণ। (বিনয়-পিটক ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০১ হইতে)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খ্যাতনামা বৌদ্ধরমণীগণ

প্রথম যুগের বৌদ্ধ-গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত খ্যাতনামা রমণীর বিবরণ পাওয়া যায় তাহাদের কয়েক জনের জীবন-চরিত আলোচনা করিব। ভারতবর্ষের প্রাচীন বৌদ্ধসমাজে নারীর স্থান যে অবহেলার যোগ্য ছিল না, এই বিবরণ হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অভিরূপনন্দা। অভিরূপনন্দা শাক্য ক্ষেমকের কন্যা। অপরূপ সৌন্দর্য্য এবং অমায়িকতার জন্য তাঁহাকে 'নন্দা' নামে অভিহিত করা হইত। যে দিন বিবাহার্থীদের ভিতর হইতে তাহার স্বামী মনোনয়ন করিয়া লইবার কথা, সেই দিনই তাহার আত্মীয় এবং প্রণয়ী চরভূত মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে সংসার ত্যাগ করিতে হয়। সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াও সে যে সুন্দরী সে কথা সে ভুলিতে পারিল না। বুদ্ধদেব তাহাকে তিরস্কার করিবেন এই আশঙ্কা করিয়া সে সর্ব্বদা তাঁহার সান্নিধ্যও বর্জ্জন করিয়া চলিত। বুদ্ধদেব জানিতে পারিলেন যে, নন্দার জ্ঞান-লাভের সময় উপস্থিত হইয়াছে; সেইজন্য তিনি উপদেশ শ্রবণের জন্য সমস্ত ভিক্ষুণীকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে মহাপজাপতী গোতমীকে আদেশ দিলেন। নন্দা নিজে না আসিয়া তাহার প্রতিনিধি প্রেরণ করিল। বুদ্ধদেব কহিলেন,—"কেহ যেন প্রতিনিধি প্রেরণ না করে।" অগত্যা তাহাকে বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত

হইতে হইল; সে উপস্থিত হইলে বুদ্ধদেব তাঁহার দৈব-শক্তির প্রভাবে এক জন সুন্দরী রমণীর দেহটাকে কুৎসিত, জরাগ্রস্ত দেহে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন। এই ঘটনা অভিপ্রেত সুফল প্রসব করিয়াছিল। ইহার পব নন্দা অর্হত্ত্ব লাভ করে। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ২৫-২৬)

জেন্তী। বৈশালী লিচ্ছবী রাজবংশে জেন্তী বা জেন্তাব জন্ম হয়। তিনি বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধম্ম শ্রবণ কবিয়া অর্হত্ত্ব লাভ কবিয়াছিলেন। তিনি সপ্ত প্রকাব সম্বোজ্ঝাঙ্গ লাভ করেন। (ঐ, পৃঃ ২৭)

চিত্তা। রাজগৃহের কোনও বিখ্যাত নাগরিকের পরিবাবে চিত্তাব জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এক দিন তিনি ভগবান তথাগতের বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং তাঁহাব ধর্ম্মে তাহার বিশ্বাস জন্মে। মহাপজাপতী গোতমী তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গৃধ্রকূটে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পর হইতে একান্তবাসিনীর জীবন যাপন করিতে থাকেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৩৩)

সুক্কা। রাজগৃহের কোনও ধনী গৃহস্থ পরিবারে সুক্কা জন্মগ্রহণ করেন। ভাল মন্দ বিচারের বয়স প্রাপ্ত হইলে ভগবান তথাগতের ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা জন্মে এবং তিনি বুদ্ধদেবের গৃহী শিষ্যা হন। এক দিন ধম্মদিন্নার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার চিত্ত অতিশয় দ্রবীভূত হইয়া পড়ে এবং তিনি গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করেন। অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য

তিনি সর্ব্ব প্রকার অনুশাসনই পালন করিয়াছিলেন এবং অনতিবিলম্বে পটিসম্ভিদা-সহকারে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সুক্কার অসাধারণ বাগ্মিতা ছিল এবং পাঁচ শত ভিক্ষু তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। একদা অন্যান্য ভিক্ষুণীদের সহিত তিনি ভিক্ষুণীদের আশ্রমে গমন করিয়া সেখানে বুদ্ধদেবের বাণী এরূপ-ভাবে প্রচার করেন যে, সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এমন কি বৃক্ষ-দেবতাও তাঁহার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অজস্র গুণ কীর্ত্তন করেন। অতঃপর জন-সঙ্ঘ তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত এবং সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে আসিয়া মনোযোগের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিত। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৫৭-৬১)

সেলা। আলবী রাজ্যের রাজকুমারীরূপে সেলার জন্ম হয়। সেইজন্য তিনি আলবিকা নামে পরিচিত ছিলেন। কুমারী অবস্থায় এক দিন রাজার সঙ্গে ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে এবং তিনি বুদ্ধের গৃহী-শিষ্যারূপে পরি-গৃহীতা হন। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং অন্তর্দৃষ্টিলাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করিতে থাকেন। মন, বাক্য এবং কার্য্যের মধ্যে যাহা কিছু জটিল সেই সমস্তকে স্ববশে আনিয়া তিনি শীঘ্রই অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যখন শ্রাবস্তীতে ছিলেন তখন তিনি সেইখানে গিয়া বাস করিতে থাকেন। দ্বিপ্রহরের ভোজন সমাধা করিয়া তিনি চিন্তা করিবার জন্য অন্ধবনে

গমন করিতেন। মার একবার তাঁহাকে বিপথগামিনী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিল। (থেরিগাথা-ভাষ্য ৬১ পৃঃ হইতে; সংযুক্ত-নিকায়, ১ম খণ্ড পৃঃ ১২৮ তুলনীয়)

সীহা। সীহা বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেনাপতি সীহের ভগিনীর কন্যা ছিলেন। মাতুলের নামেই তাঁহার নামকরণ হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভগবান বুদ্ধদেব যখন তাঁহার মাতুলের কাছে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন সেই সময় সীহা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন। ইহার পরেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার মনে গভীর শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। পিতা-মাতাও তাঁহাকে সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন। সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াও তাহার মন বাহ্য বস্তুর আকর্ষণে মুগ্ধ থাকায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। এইজন্য তাঁহার মনে মৃত্যুর বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠে। এক গাছি রজ্জু বৃক্ষ শাখায় বাঁধিয়া তাহাই গলায় জড়াইয়া তিনি যখন আত্মহত্যা করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনের ভিতরে অন্তর্দৃষ্টির উদয় হয় এবং তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। অতঃপর গ্রীবাদেশ হইতে রজ্জু খুলিয়া ফেলিয়া তিনি কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৭৯-৮০)

সুন্দরী নন্দা। শাক্য রাজবংশে সুন্দরী নন্দার জন্ম হয়। অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য তাহাকে ঐ নামে অভিহিত করা হইত। তাহার জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মাতা, ভগ্নী, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে সংসার

ত্যাগ করিতে দেখিয়া তিনিও সংসার-ত্যাগ করেন কিন্তু সংসার ত্যাগ করার পরেও তাহার মন হইতে সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব দূর হয় নাই। পাছে তাহার এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ভগবান বুদ্ধদেব তাহাকে তিরস্কার করেন, সেইজন্য সে কখনও বুদ্ধদেবের সম্মুখীন হইত না। অভিরূপনন্দাকে ভগবান তথাগত যেরূপ ভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এই নন্দাকেও তিনি সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দেন। ইহার পর তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া সে নির্ব্বাণের প্রথম সোপানে আরোহণ করে। নন্দাকে উপদেশ দানের সময় ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, "নন্দা, এই দেহের ভিতর এক-টুকুও সার পদার্থ নাই। ইহা মাংস ঢাকা এবং রক্তমাখা কতকগুলি হাড়ের সমষ্ঠি মাত্র। ইহা মৃত্যু এবং ধ্বংসের অধীন।" পরে নন্দা অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৮০ হইতে; মনোরথ-পূরণী, পৃঃ ২১৭-২১৮ তুলনীয়)

ক্ষেমা। সাগলের রাজবংশে ক্ষেমার জন্ম। ক্ষেমা অত্যন্ত সুন্দরী ছিল এবং তাঁহার দেহের বর্ণ সুবর্ণের মত। তিনি বিম্বিসারের মহিষী হন। এক দিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে বুদ্ধদেব সৌন্দর্য্যের নিন্দা করেন। তাহার পর হইতে তিনি আর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন না। রাজা বিম্বিসার বুদ্ধদেবের এক জন পরম ভক্ত ও তাঁহার ধর্ম্ম-মতের প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি রাণীর মনোভাব পরিবর্ত্তনের জন্য সভা কবিকে বেলুবন আশ্রমের গৌরব সম্বন্ধে গান রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে আদেশ দেন। আদেশ প্রতি-পালিত হইল। আশ্রমের সৌন্দর্য্য বর্ণনা শ্রবণ করিয়া

ক্ষেমা রাজার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বেলুবন-বিহার পরিদর্শনে গমন করেন। তখন বুদ্ধদেব বেলুবনেই অবস্থান করিতেছিলেন। যখন তাঁহাকে বুদ্ধদেবের সমীপে লইয়া যাওয়া হয় তখন তিনি জনৈক সুন্দরী রমণীকে স্বর্গের অপ্সরীতে রূপান্তরিত করেন সে তাঁহাকে তাল বৃন্তের দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল। এই রমণীটিকে ক্ষেমার শিক্ষার জন্যই বুদ্ধদেব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী এই রমণীটিকে দেখিয়া ক্ষেমা লজ্জায় মাথা নত করেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, রমণীটির দেহ পবিবর্ত্তিত হইতেছে। যৌবন হইতে তাহার দেহ প্রৌঢ়ত্বে পরিণত হইল, তাহার পর বার্দ্ধক্য গ্রহণ করিল। তাহার পর চুল পাকিল, দাঁত পড়িল, দেহে বলীরেখা দেখা দিল, তারপর সে দেহ তালবৃন্ত-সহ মাটির উপর লুটাইয়া পড়িল। ক্ষেমা তখন মনে করিলেন, এই অপ্সরীটির দেহের যে দশা হইল, তাহারও এই সুন্দর দেহের পরিণামও তাহাই হইবে। ভগবান বুদ্ধ তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়া কহিলেন—"যে সব লোক কামনার দাস, তাহারা তাহাদের কার্য্যের ফলভোগ করে, সেইজন্য যাঁহারা বন্ধন হইতে মুক্ত তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করেন"। ভগবান বুদ্ধের কথা শেষ হইলে থেরীগাথা অনুসারে ক্ষেমা অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু অবদানের মতানুসারে তিনি নির্ব্বাণের প্রথম সোপানে আরোহণ করেন এবং অর্হত্ব লাভের পূর্ব্বে রাজার অনুমতি লইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরে ক্ষেমা অন্তর্দৃষ্টির জন্য

বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং গভীর জ্ঞানের জন্য যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেন। মার তাঁহার ভিতর কাম-ভাবের উদ্রেক করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। (থেরীগাথা-ভাষ্য পৃঃ ১২৬ ইত্যাদি মনোরথ-পূরনী পৃঃ ২০৫ ; অঙ্গুত্তর-নিকায় ১ম খণ্ড পৃঃ ২৫ তুলনীয়)

অনোপমা। অনোপমা সাকেতর মজ্ঝা নামক একজন বণিকের কন্যা। তাহার সৌন্দর্য্যের উপমা ছিল না। বহু বণিকের পুত্র, বড় বড় রাজকর্ম্মচারী তাঁহার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারেন ,যে গৃহে সুখ নাই। তাই তিনি ভগবান তথাগতের নিকট গমন করিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করেন। এইরূপে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিপক্কতা লাভ করে। অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য সুকঠোর সাধনা করিয়া তিনি নির্ব্বাণের তৃতীয় স্তরে আরোহণ করেন। ইহার পর হইতে সপ্তম দিবসে তিনি অহরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরীগাথা-ভাষ্য পৃঃ ১৩৪ ১৩৯)

রোহিণী। বৈশালীর একটি বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে রোহিণীর জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ভগবান তথাগতের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার শ্রবণ করেন। এইরূপে তিনি সোতাপত্তিফল অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা-মাতাকে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়ে টানিয়া আনেন, এবং তাঁহাদের অনুমতি লইয়া নিজে কৃচ্ছ সাধন করিয়াছিলেন এবং অনতিবিলম্বে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরীগাথা ভাষ্য পৃঃ ২১৪ হইতে)

শুভা। শুভা রাজগৃহের জনৈক স্বর্ণকারের কন্যা। সে অত্যন্ত রূপবতী ছিল এবং সেই জন্যই তাহার নাম শুভা হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে ভগবান বুদ্ধদেবকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করে এবং তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি তাহার অনুরাগের সঞ্চার হয়। ভগবান বুদ্ধদেব তাহার নৈতিক বৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ অবলোকন করিয়া তাহাকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন এবং সে নির্ব্বাণেব প্রথম সোপানে আরোহণ করে। ইহার পর সে মহা-পজাপতী গৌতমীর ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিল। অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য কঠোর সাধনা করিয়া যথা সময়ে সে অর্হত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। (থেরীগাথা-ভাষ্য· পৃঃ ২৩৬ হইতে)

তিষ্‌সা। কপিলাবস্তুতে শাক্যদের ভিতর তিষ্-সার জন্ম হয়। মহাপজাপতি গোতমীর সহিত সে সংসার ত্যাগ করে। তাহার ভিতরে আধ্যাত্মিক ভাব এতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল যে সে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল। (থেরীগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ১১)

সুমেধা। মন্তাবতীর রাজা কোঞ্চার কন্যা সুমেধা বাল্যকাল হইতেই আমোদ প্রমোদের অপক্ষপাতীনি ছিলেন। ভিক্ষুনীদের নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ করেন। অনতি-বিলম্বেই অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জন করিয়া তিনি অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরীগাথা-ভাষ্য পৃঃ ২৭২)

বিসাখা। বিসাখা মেণ্ডক শেট্‌ঠির পুত্র ধনঞ্জয় শেট্‌ঠির পত্নী সুমনা দেবীর কন্যা। অঙ্গ রাজ্যের ভদ্দিয় নগরে তাঁহার পিত্রালয় ছিল। তাঁহার বয়স যখন

সাত বৎসর তখন বুদ্ধদেব ভিক্ষুণী সঙ্ঘের সহিত ভদ্দিয় নগরে গমন করেন। রাজা যাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেন সুমনাদেবী তাঁহাদেরই একজন ছিলেন। পাঁচশত সহচরী এবং পাঁচশত রথ লইয়া বিসাখা বুদ্ধকে অভ্যর্থনার জন্য গমন করেন। ভগবান তথাগত বিসাখাকে তাঁহার স্বভাবানুযায়ী উপদেশ প্রদান করায় তিনি সোতাপত্তিফলম্ লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর বুদ্ধদেব বিশাখার গৃহে নিমন্ত্রিত হন। শ্রাবস্তী নগরের পুণ্ণবদ্ধনের সহিত পঞ্চগুণালঙ্কৃতা বিশাখার বিবাহ হয়। শ্রাবস্তীর নাগরিকেরা তাহাকে যে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন সে সমস্তই তিনি অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত নাগরিকদের ভিতরেই বিতরণ করেন। এইরূপে নাগরিকেরা তাঁহার আত্মীয় স্বজনে পরিণত হয়। তাঁহার শ্বশুর যে সব নগ্ন বিধর্ম্মীকে অর্চ্চনা করিতেন বিসাখা তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে অস্বীকার করেন। বিসাখার চেষ্টাতেই অবশেষে তাঁহার শ্বশুরও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা তিনি ভিক্ষুদিগকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার শ্বশুরও সোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছিল। (ধম্মপদত্থ-কথা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪ হইতে) তাঁহার পৌত্রকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এই পৌত্রটি মারা যাইবার পর সিক্ত বস্ত্রে, সিক্ত কেশে তিনি বুদ্ধদেবকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রাবস্তীর সমস্ত লোক যদি তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র হয়; তবে তিনি সন্তুষ্ট হন কি না? "তিনি" উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, হই।" ভগবান

তথাগত তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রাবস্তীর কত জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ?" বিশাখা উত্তর দিলেন—"এক হইতে দশ জন।" বুদ্ধদেব তাঁহাকে কহিলেন,—"এইবার তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, সিক্ত বস্ত্র এবং সিক্ত কেশ হইতে তোমার কখনও মুক্তি লাভের সম্ভাবনা আছে কি না।" উত্তরে বিশাখা কহিলেন,—"তবে আমি এত পুত্র এবং পৌত্র কামনা করি না। বেশী পুত্র এবং পৌত্র দুঃখই আনয়ন করে।" (উদান ৯১-৯২) বুদ্ধদেবের দানশীলা নারী ভক্তদের ভিতর মিগারের মাতা বিসাখাই সর্ব্বশ্রেষ্টা ছিলেন। (অঙ্গুত্তর-নিকায় ১ম খণ্ড পৃঃ ২৬) এক পুণ্য দিনে বুদ্ধদেব যখন তাঁহার পুব্বারামে অবস্থান করিতে-ছিলেন, বিসাখা তখন নিকটে গমন করেন। বুদ্ধদেব তখন বিসাখাকে এই বলিয়া উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন,—"তিন রকমের উপসথ আছে, তাহার ভিতর আর্য্য উপসথই সর্ব্বশ্রেষ্ট। যিনি এই আর্য্য উপসথ পালন করিবেন, তাঁহাকে বুদ্ধ, ধম্ম এবং সঙ্ঘ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে। তাঁহাকে শীল-সমূহ মানিয়া চলিতে হইবে—তাহার কোনটীও তিনি লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে দেবতাদের গুণ সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে। যে অর্হৎ আজীবন অনু-শাসন মানিয়া চলিয়াছেন সেইরূপ অর্হতকেই তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। আর্য্য উপসথ পালনের দ্বারা লোক মহাআনন্দের অধিকারী হয় এবং চতুম্মহা রাজিক হইতে আরম্ভ করিয়া পরনিম্মিত বশবর্ত্তী দেবতাদের দ্বারা অধিবসিত স্বর্গের যে কোনও

স্বর্গে সে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। সে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে।” (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭-২১৫) বুদ্ধ তাহাকে আরও বলেন, “পরনির্ভরতা দুঃখ আনয়ন করে, স্বাধীনতাই আনন্দের কারণ।” (উদান পৃঃ ১৮) উপবাসের সময় তাঁহার পৌত্রকে দীক্ষিত না করার জন্য একবার বিসাখা ভিক্ষুদের প্রতি দোষারোপ করিয়াছিলেন; কারণ এই বিলম্বের জন্য তাঁহার পৌত্রের মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। (বিনয়-পিটক ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩) একদা বিশাখা বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া ভিক্ষুদের সহিত পর দিন প্রাতঃকালে তাঁহার গৃহে আহার করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। প্রাতঃকালে ভীষণ বারি-বর্ষণ আরম্ভ হয় এবং ভিক্ষুদের স্নানের বস্ত্র ছিল না বলিয়া তাঁহারা নগ্ন হইয়া স্নান করেন। বিসাখার পরিচারিকা ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়া এই ব্যাপার অবগত হয় এবং সে তাহার প্রভুপত্নীর কাছে এই ঘটনার কথা বিবৃত করে। বুদ্ধদেব এবং ভিক্ষুরা তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইলেন এবং ভোজন শেষ হইলে বুদ্ধের নিকট নিম্নলিখিত বর কয়টি যাচ্ঞা করিলেন—“যতদিন পর্য্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন তিনি ভিক্ষুদিগকে বর্ষার পরিচ্ছদ দান করিবেন; অতিথিকে এবং যাঁহারা দুরদেশে গমন করিবেন তাহাদিগকে খাদ্য দান করিবেন; পীড়িত ভিক্ষুদিগকে এবং পীড়িত শুশ্রূষাকারিণীদিগকে পথ্য এবং ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুদিগকে ঔষধ ও অন্নমণ্ড প্রত্যহ দান করিবেন।” (বিনয়-পিঠক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯০-২৯২)

এই ঘটনা হইতে বোঝা যায় যে, ভিক্ষুণীদের স্নানের পরিচ্ছদ বিসাখার দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিসাখা বুদ্ধদেবকে একখানি গাত্র-মার্জ্জনী উপহার দিয়াছিলেন এবং সে উপহার তিনি গ্রহণও করিয়াছিলেন। (বিনয়-পিঠক ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৬) এ কথাও শোনা যায় যে, বিবাদপরায়ণ কোশম্বীর ভিক্ষুদের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিসাখা বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের সহিত কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে কলহরত উভয় দলের সন্ন্যাসীকেই দান করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। (বিনয়-পিটক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬) বিসাখা বুদ্ধদেবের জন্য একটি সোনার জলপাত্র প্রস্তুত করান। সুমন নামক জনৈক শ্রমণ এই পাত্র করিয়া অণতত্ত হ্রদ হইতে তাঁহার জন্য জল আনয়ন করিয়াছিলেন (ধম্মপদত্থ-কথা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৫) বিসাখা বুদ্ধদেবকে একটি জলপাত্র এবং এক খানি সম্মার্জ্জণী দান করেন। বুদ্ধদেব তাহা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুদিগকে তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। একদা বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া তিনি তাঁহাকে এক খানি তাল পত্রের পাখা দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এ উপহারও গ্রহণ করেন। (বিনয় -পিঠক ২য় খণ্ড পৃঃ ১২৯-১৩০) ভিক্ষুদের প্রতি বিসাখার অনুগ্রহের অন্ত ছিল না। তিনি তাঁহাদের বাসের জন্য একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করান। ভিক্ষুরা প্রথমে এ প্রাসাদে বাস করিতে ইতস্ততঃ করায় বুদ্ধ তাঁহাদিগকে বাস করিবার জন্য অনুমতি দান করেন। (বিনয়-পিঠক,

২য় খণ্ড পৃঃ ১৬৯) বিসাখা খদিরবনিয়রেবত বিহার দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই বিহারটি কণ্টক বনের ভিতর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পান। ইহা তখন মানুষের বাসের অযোগ্য ছিল। (ধম্মপদত্থ কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৮-২০০) বৌদ্ধ সঙ্ঘের ভিতর তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভিক্ষুদের সম্পর্কে কোন ব্যাপারে কাহারও মত লওয়া আবশ্যক হইলে তাঁহাকে মত জিজ্ঞাসা করা হইত। কুণ্ডধান থের একটি স্ত্রীলোককে পিছনে লইয়া ভ্রমণ করিত। এই কুণ্ডধান সম্পর্কেও তাহার মত গ্রহণ কবা হইয়াছিল। (ধম্মপদত্থ-কথা ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫) বিসাখার পরিবার ভুক্ত বালিকাদিগকে ভিক্ষুদের ভোজনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি সেবার ভার গ্রহণ করিতে হইত। (ধম্মপদত্থ-কথা ৩য়খণ্ড, পৃঃ ১৬১) বিসাখার অনুপস্থিতিতে তাঁহার দত্তা নামক পৌত্রের উপর ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবার ভার ন্যস্ত ছিল সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার শোকে বিসাখা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন। বুদ্ধদেব নিজে তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন। (ধম্মপদত্থকথা ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৮ ২৭৯) এক দিন নগরোদ্যানে গমন করিবার সময় বিসাখা তাঁহার সর্ব্বদেহ নানা অলঙ্কারে ভূষিত করেন। এই অলঙ্কার গুলির ভিতর এক খানি অপূর্ব্ব রাস্তায় আসিয়া তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়া যায় এবং তিনি চিন্তা করেন বালিকার ন্যায় নগরোদ্যানে না গিয়া বিহারে যাইয়া বুদ্ধের ধর্ম্মালোচনা শুনাই তাহার উচিত। এই বাসানা প্রণোদিত হইয়া তিনি বিহার অভিমুখে গমন করিলেন, এবং বুদ্ধের সমীপস্থ

হইবার পূর্ব্বে মহালতা অলঙ্কার খুলিয়া পরিচারিকার হস্তে দিয়া উহা বিহার হইতে ফিরিবার পর আবার তাহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য উপদেশ দিলেন। বিহারে ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী শুনিয়া তাঁহার চিত্ত পবিত্র হইল। ফিরিয়া আসিয়া তিনি পরিচারিকার নিকট ঐ অলঙ্কার খানি ফেরৎ চাহিয়া জানিতে পারিলেন যে সে উহা বিহারেই ফেলিয়া আসিয়াছে। বিহারে পুনরায় ফিরিয়া গিয়া উহা যখন পাওয়া গেল তখন বিসাখা উহা বুদ্ধদেবকে দান করেন। বুদ্ধদেবের আদেশে এই অলঙ্কার বিক্রয়ের অর্থ দিয়া একটি বিহার নির্ম্মিত হয়। অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া ৯ ক্রোর ১ লক্ষ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। এই বিহার নির্ম্মাণের সমস্ত মূল্য বিসাখা তাঁহার পরিচারিকাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। পরিচারিকাও উহা গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার অল্পদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়। (বিমানবত্থু ভাষ্য, পৃঃ ১৮৭-১৮৯)

অনুলা। সিংহলের রাজার পত্নী। পাঁচশত রমণী পরিবৃতা হইয়া তিনি থেরদিগকে প্রণাম ও অন্তরের একাগ্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। থের মহিন্দ তাঁহাদের নিকট ধম্ম প্রচার করেন। পেত্ত কাহিনী বিমান কাহিনী এবং সচ্চসমযুক্ত তাঁহাদের কাছে বিবৃত করা হয়। ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি শোনার পর রাণী অনুলা এবং তাঁহার পাঁচশত সহচরী সোতাপত্তি লাভ করেন এবং বুদ্ধ, ধম্ম ও সঙ্ঘের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মে। মহাথেরী সঙ্ঘমিত্তার নিকট তিনি এবং তাঁহার পাঁচশত সহচরী

পব্বজ্জা লাভ করিয়াছিলেন। (দীপবংশ, পৃঃ ৬৮-৮৮; মহাবংস, পৃঃ ১০৮ ও ১৫৫)

গোপিকা। শাক্য রাজকুমারী। বুদ্ধ, ধম্ম এবং সঙ্ঘের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি অনুশাসনগুলি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। নারী জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া তিনি পুরুষ হইবার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন। (দীঘনিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭১)

চন্দা। ব্রাহ্মণ পরিবারে চন্দার জন্ম হয়। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সে জীবিকা উপার্জ্জন করিত। এক দিন যেখানে পটাচারা কেবল মাত্র তাঁহার ভোজন শেষ করিয়াছেন, এমন সময় তিনি সেখানে আসিয়া উপনীত হয়। ভিক্ষুণীরা ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ আহার্য্য প্রদান করিলেন। আহার করিয়া সে একপাশে উপবেশন করিল। এই সময় পটাচারা যে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহাই শ্রবণ করিয়া সে সংসার ত্যাগ করে। অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য চন্দা কঠোর সাধনা করিয়াছিল। গভীর জ্ঞান এবং দৃঢ় ইচ্ছা শক্তির বলে পটিসম্ভিদা-সহকারে সে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল। (থেরিগাথা ভাষ্য, পৃঃ, ১২০-১২১)

গুত্তা। শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনেই গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়। সুতরাং পিতামাতার অনুমতি লইয়া তিনি মহাপজাপতী গোতমীর অধীনে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন; কিন্তু সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াও

কিছু দিনের জন্য বাহিরের বিষয় সম্পর্কে তাঁহার মনের চাঞ্চল্য দূর হয় না। অতঃপর ভগবান তথাগত তাঁহাকে যথোচিত উপদেশ দান করিলে তিনি পতি-সম্ভিদা সহকারে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা ভাষ্য, পৃঃ ১৫৭-১৫৯)।

বিজয়া। রাজগৃহের কোনও সম্ভ্রান্ত বংশে বিজয়ার জন্ম হয়। বিজয়া ক্ষেমার সখী ছিলেন। যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, রাজমহিষী ক্ষেমা সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি ক্ষেমার নিকট গমন করেন। ক্ষেমা তাঁহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া, ভিক্ষুণীর ব্রতে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। অনতি বিলম্বে তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন এবং বিশ্লেষাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া অর্হত্ব অর্জ্জন করেন। (থেরিগাথা ভাষ্য পৃঃ ১৫৯-১৬০) এক দিন মার তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়া বলে, "তুমি তরুণী এবং সুন্দরী, আমিও তরুণ এবং সুন্দর। অতএব এস, আমরা সঙ্গীত সুধা উপভোগ করি।" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি রূপ, স্বাধ গন্ধ প্রভৃতিতে আনন্দ উপভোগ করি এবং আমি পেলব স্পর্শ পছন্দ করি না। যে দেহ সহজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় আমি সেই ক্ষণবিধ্বংসী দেহকে ঘৃণা করি। আমার অজ্ঞানতা বিদূরিত হইয়াছে।" ইহার পর মার তাহাকে পরিত্যাগ করে। (সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ, ১৩০-১৩১)

চালা, উপচালা, শিশুপচালা। চালা, উপচালা এবং শিশুপচালা মগধের নালক নামক স্থানের

সুরূপসারী নাম্নী ব্রাহ্মণ রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সারিপুত্ত ইহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। ভ্রাতার সংসার-পরিত্যাগের কথা শুনিয়া ইহারাও সংসার-পরিত্যাগ করে এবং কঠোর সাধনার দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করে। মার ইহাদের মনে কাম-প্রবৃত্তির উদ্রেক করিতে গিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিল। (থেরিগাথা ভাষ্য, পৃ, ১৬২-১৬৩; সংযুক্ত নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ, ১৩২-১৩৪)

উপ্পলবণ্ণা। শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে উপ্পলবণ্ণার জন্ম হয়। তাহার দেহের বর্ণ নীল পদ্মের গর্ভের বর্ণের ন্যায় ছিল। এই জন্যই তাহাকে উপ্প-লবণ্ণা নামে অভিহিত করা হইত (সামন্তপাসাদিকা, ১ম খণ্ড, ২৭২-২৭৩ তুলনীয়)। বহুরাজ-পুত্র এবং শ্রেষ্ঠী পুত্র তাহার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘে গমন করেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সঙ্ঘে প্রবেশের পর এক দিন একটি দীপ জ্বালাইয়া তাহার শিখা সম্বন্ধে ক্রমাগত চিন্তা করিতে-করিতে তিনি অভিণ্ণা এবং পতিসম্ভিদা সহ অর্হত্ত্ব লাভ করেন (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ১৮২)। যাঁহারা ঋদ্ধি-সম্পদে ভূষিত ছিলেন তাঁহাদের ভিতর উপ্পলবণ্ণাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়। (মনোরথপূরণী, পৃঃ, ৩৫৬; অঙ্গুত্তর-নিকায়, পৃঃ ২৫) সংযুক্ত-নিকায় গ্রন্থে দেখা যায় যে, উপ্পলবণ্ণা ধ্যান করার জন্য অন্ধবনে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে একটি শাল বৃক্ষের পাদদেশে উপবেশন করিলে মার তাঁহার নিকটে আসিয়া বলে, "তুমি

একটি পূর্ণ বিকশিত শাল তরুর মূলে বসিয়া আছ। তুমি কি দুর্জ্জনের আশঙ্কা কর না? উপ্পলবন্না বলিলেন,—"আমি দুর্জ্জনকেও ভয় করি না, আমি তোমাকে গ্রাহ্য করি না।" এই কথা শুনিয়া মার তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। (সংযুক্ত-নিকায় পৃঃ ১ম খণ্ড, ১৩১ ১৩২) মারকে পরাজিত করিলেও উপ্পলবন্না তাঁহার মাতুল পুত্র আনন্দের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। উপ্পলবন্নার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সে তাহাকে বিবাহ করিতে চায় এবং তিনি ভিক্ষুণী-ব্রত অবলম্বন করিলেও তাঁহাকে বিবাহ করিবার আশা ত্যাগ করিতে পারে না। এক দিন তাঁহাব অনুপস্থিতিতে আনন্দ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া খট্টার তলে লুকাইয়া থাকে এবং উপ্পলবন্না গৃহে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলে অকস্মাৎ খাটের তলদেশে হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার উপর বলাৎকার করে। উপ্পলবন্না এই ঘটনা ভিক্ষুণীদের কাছে বিবৃত করেন এবং ভিক্ষুণীরা আবার ভিক্ষুদের দ্বারা তাহা বুদ্ধকে জ্ঞাপন কবেন। এই ব্যাপারের পরেই বুদ্ধদেবের আদেশে ভিক্ষুণীদের বনে বাস করা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। (ধম্মপদত্থকথা, পৃঃ ২য় খণ্ড, ৪৮-৫১) ৩৬০০০ যোজন-ব্যাপী যাহার অনুচরদলের বিস্তৃতি সেইরূপ একটি রাজার জাক-জমক সহকারে বুদ্ধদেবের পূজা করিবার জন্য তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া উপ্পলবন্না এক অমানুষিক শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১২ যোজন ব্যাপী একটি সভা তাঁহার এই অমানুষিক শক্তির কার্য্য-কলাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল (ধম্মপদত্থকথা. ৩য় খণ্ড পৃঃ ২১১)।

সুমঙ্গল মাতা। শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র পরিবারে সুমঙ্গল মাতার জন্ম হয়। এক জন ঝুড়ি প্রস্তুত কারীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি মহাপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গৃহী অবস্থায় তিনি যে সব দুঃখ ভোগ করিয়াছেন তাহাই চিন্তা করিতে করিতে এক দিন চিত্ত বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়ে এবং তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। বিশ্লেষাত্মিক জ্ঞানের সহিত তিনি অর্হত্ত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ২৮-৩০)।

পুন্না। পুন্না অথবা পুন্নিকা পূর্ব্বজন্মে মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু অহঙ্কারের নিমিত্ত পাপের মূলোৎপাটনে তিনি অসমর্থ হন। অনাথপিণ্ডিকের গৃহে শ্রাবস্তীতে তিনি পারিবারিক ক্রীতদাসী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সীহনাদ সুত্তন্ত শ্রবণ করিয়া তিনি সোতাপত্তি ফল লাভ করেন। উদক সুদ্ধিক নামে এক জন ব্রাহ্মণকে তর্কে পরাজিত করায় অনাথ পিণ্ডিক তাঁহাকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। ইহার পর সংসার পরিত্যাগ করিয়া পুন্না সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। অন্তর্দৃষ্টি লাভের সাধনা করিয়া তিনি শীঘ্রই পটিসম্ভিদা-সহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

সুন্দরী। সুজাত নামক এক ব্রাহ্মণের কন্যারূপে সুন্দরী বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের মৃত্যুতে সুজাত শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং থেরী বাশিষ্ঠীর উপদেশ অনুসারে সংসার পরিত্যাগ করেন। মিথিলাতে বুদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া অর্হত্ত্ব

লাভ করিয়াছিলেন। পিতার এই সংসার পরিত্যাগের কথা শুনিয়া সুন্দরী সমস্ত ধন সম্পদ ও সর্ব্ব প্রকার সুখেচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া মাতার অনুমতি অনুসারে সংসার ত্যাগ করেন। অতঃপর সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া কঠোর সাধনাব দ্বারা পটিসম্ভিদা সহ তিনি অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ২২৮ হইতে)।

বিমলা। একটি বারবণিতার কন্যারূপে বিমলা বৈশালীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক দিন ভিক্ষার্থে মহামোগ্‌গল্লানকে গমন করিতে দেখিয়া তাহার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয় এবং সে তাঁহার গৃহে গিয়া তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে। এই অপরাধের জন্য মহামোগ্‌গল্লান তাহাকে তিরস্কার করেন। ইহার পর হইতেই তাহার মনে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জাগিয়া উঠে এবং সে বুদ্ধদেবের গৃহী শিষ্যা হয়। ইহার কিছুদিন পরেই সে সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া অনতিবিলম্বে অর্হত্ব অর্জ্জন করিয়াছিল। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৭৬-৭৭)।

মিত্তাকালিকা। কুরুরাজ্যে কম্মাস্‌সধম্মা নগরে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে মিত্তাকালিকার জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এক দিন সে মহাসতিপত্থান আলোচনা প্রসঙ্গে উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করে। সাত বৎসর পর্য্যন্ত সে তাহার বুদ্ধির বিশেষ উন্নতি করিতে পারে না। পরে বিশ্লেষাত্মক জ্ঞান সহ অর্হত্ব লাভ করিয়াছিল। (থেরিগাথা-ভাষ্য পৃঃ ৮৯-৯০)।

সকুলা (পকুলা)। সকুলা (পকুলা) শ্রাবস্তীর

এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব যখন জেতকুঞ্জে উপহার গ্রহণ করিতে-ছিলেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। এক দিন এক জন অর্হতের বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার এই অনুরাগ আরও বর্দ্ধিত হয়। ইহার পর তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং কঠোর সাধনার দ্বারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করেন। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না ভিক্ষুণীদের ভিতর ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য পৃঃ ৯১ হইতে অঙ্গুত্তর-নিকায় ১ম খণ্ড, ২৫ তুলনীয়)।

সোনদিন্না। সোনদিন্না নালন্দার অধিবাসিনী। তিনি ভিক্ষুদিগকে চারিটি প্রয়োজনীয় বস্তুর দ্বারা সেবা করিতেন এবং অনুশাসনগুলি এবং উপোসথ যথা-নিয়মে প্রতিপালন করিতেন। চারিটি মহাসত্যের ধ্যান করিয়া তিনি সোতাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন (বিমানবত্থু-ভাষ্য ১১৫)।

উপোসথ। উপোসথ নাম্নী একটি শিষ্যা সাকেত নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ভিক্ষুদিগকে তিনি তাঁহাদের প্রয়োজনীয় চারিটি বস্তু দান করিতেন এবং চারিটি মহা সত্য সম্বন্ধে ধ্যান করিতেন। এইরূপে তিনি সোতাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ১১৫)

অলোমা। বারাণসীর শ্রাবস্তী নামক স্থানে আলোমা নাম্নী একটী দরিদ্র রমণী বাস করিতেন। আর কোনও জিনিস না পাইয়া তিনি কতকগুলি পচা

অন্ন বিনা লবণে বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন। তিনিও এই দান গ্রহণ করেন। এই পুণ্য কর্ম্মের জন্য মৃত্যুর পর অলোমা তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ১৮৪)

মুত্তা। মুত্তা শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসর, সেই সময় মহাপজাপতী গোতমীর নিকট হইতে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কম্মট্ঠান অভ্যাস করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। পরে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৮-৯)

পুন্না। পুন্না শ্রাবস্তীর এক জন প্রধান নাগরিকের কন্যা। তাঁহার বয়স যখন ২০ বৎসর তখনই মহাপজাপতীর ধর্ম্মোপদেশ তিনি শ্রবণ করেন এবং সংসার পরিত্যাগ করেন। ভগবান বুদ্ধের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য সাধনা করিয়াছিলেন। যথাসময়ে তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৯-১০)

দন্তিকা। কোশলের এক পুরোহিত পরিবারে দন্তিকা জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জেতবনে বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। পরে রাজগৃহে তিনি মহাপজাপতী গোতমীর ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ করেন। রাজগৃহে থাকা কালে আহারের পর তিনি গৃধ্রকূটে আরোহণ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিবার সময় অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই

বিশ্লেষাত্মক জ্ঞান-সহ তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৫১-৫২)

বঙ্কেসী। বঙ্কেসী মহাপজাপতী গোতমীর পরিচারিকা ছিল। তাহার প্রভুপত্নী যখন সংসার ত্যাগ করেন তখন সেও তাঁহার অনুসরণ করে। ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত সে ইন্দ্রিয় সমূহের কামনার দ্বারা নিপীড়িত হয় এবং মনকে সংযত করিতে পারে না। এক দিন সে ধম্মদিন্নাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিল। তাহার পর হইতে সে ধ্যান করিতে আরম্ভ করে। অনতিবিলম্বেই সে ছয়টি দৈব শক্তির অধিকারিণী হইয়াছিল। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৭৫-৭৬)

উত্তমা। বন্ধুমতি নামক স্থানের কোনও এক গৃহস্থ পরিবারে উত্তমার জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পাটাচারার বক্তৃতা শুনিয়া তিনি সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। পাটাচারার উপদেশে তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন অনতিবিলম্বেই অর্হত্ব লাভ করেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৪৭-৪৮)

উত্তরা। উত্তরা শ্রাবস্তীর কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পটাচারার ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগিণী হন এবং সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। তিনি অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ১৬১-১৬২)

উত্তরী। উত্তরী এক জন থেরী ছিলেন। তাহার বয়ঃক্রম ১২০ বৎসর হইয়াছিল। ভিক্ষার দ্বারা তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এক দিন ভিক্ষায় বাহির

হইয়া পথে তাঁহার সহিত বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া উত্তরী পড়িয়া যান। বুদ্ধদেব তাঁহাকে একটি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। নির্ব্বাণের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়া তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হন। (ধম্মপদত্থকথা-ভাষ্য, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০)

খুজ্জ ত্তরা। খুজ্জুত্তরা কোশম্বীর রাজা উদয়নের মহিষী সামাবতীর দাসী ছিল। মালাকর সুমনর নিকট হইতে সে প্রত্যহ ৮ কহাপনের ফুল ক্রয় করিত। একদা বুদ্ধদেব ভিক্ষুসঙ্ঘেব সহিত আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া সুমনের গৃহে গমন করেন। এই উপলক্ষে খুজ্জুওরা সুমনের গৃহে বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে। ফলে সে সোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হয়। ফুল কিনিবার নিমিত্ত তাহার প্রভুপত্নী তাহাকে যে ৮ কহাপন প্রদান করিতেন পূর্ব্বে তাহা হইতে ৪ কহাপণ চুরী করা তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছিল। কিন্তু সোতাপত্তি ফল লাভ করার পর হইতে সে ৮ কহাপনেরই ফুল কিনিত। এত বেশী ফুল পাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া রাণী সামাবতীকে বলে, "মহারাণী, আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি ; বুদ্ধের উপদেশ যাহারা শ্রবণ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে চুরী করা পাপ।" তাহার পর তাহার নিকট হইতে ধর্ম্ম কথা শুনিয়া রাণী সামাবতীও সোতাপত্তি ফল লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিপিটক সম্বন্ধে তাহার গভীর জ্ঞান ছিল। (ধম্মপদত্থকথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৮ হইতে)

দিন্না। দিন্না বুদ্ধদেবের উপাসিকা ছিলেন। তিনি

রাজা উগ্‌গসেনের মহিষী। এক জন রাজা প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর রাজ-পদে অভিষিক্ত হন তবে জম্বুদ্বীপের এক শত রাজার রক্ত দ্বারা নিগ্রোধ বৃক্ষের দেবতাকে অর্চ্চনা করিবেন। অতঃপর তিনি রাজাদিগকে ক্রমে ক্রমে পরাজিত করিয়া দেবতার অর্চ্চনার জন্য গমন করেন। বহু নৃপতি হত্যা হইতেছে দেখিয়া বৃক্ষ-দেবতা বলি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন, "রাজা উগ্‌গসেনের যে রাণীকে তুমি পরাজিত করিয়াছ তাহাকে না আনা পর্য্যন্ত আমি তোমার পূজা গ্রহণ করিব না।" রাণীকে সেখানে আনা হইল। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে নর-হত্যা নিবারণের সম্বন্ধে এক ব্যবস্থা প্রদান করেন। দেবতাও রাণীর বাণীই সমর্থন করায় রাজা নরহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিলেন এবং পরাজিত ও বন্দী নৃপতিদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন। অতঃপর মুক্তপ্রাপ্ত রাজারা দিন্নার অজস্র প্রশংসা করেন। এইরূপে দিন্নার দ্বারা বহু নরপতির প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। (ধম্মপদত্থকথা, ২য় খণ্ড পৃঃ ১৫ হইতে)

সোনা। শ্রাবস্তীর একটি সম্ভ্রান্ত বংশে সোনার জন্ম। বিবাহের পর তিনি দশটি সন্তান প্রসব করেন। সেই জন্য তাঁহাকে বহুপুত্রিক নাম নেওয়া হয়। ধম্ম-পদত্থকথার মতে তাঁহার সাতটি পুত্র এবং সাতটি কন্যা ছিল (ধম্মপদত্থকথা ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৬-২৭৮)। তাঁহার স্বামী সংসার ত্যাগ করার পর তিনি সমস্ত ধনরত্ন সমান ভাবে তাঁহার পুত্রদিগকে ভাগ করিয়া দিয়া-ছিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই পুত্রেরা এবং বধূরা

তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকেন। এই নিমিত্ত তিনি ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করবার জন্য কঠোর সাধনা করেন। ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহাকে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পবে তিনি অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য পৃঃ ৯৫) কঠোর সাধনার দ্বারা তিনি ভিক্ষুণীদের ভিতর শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী হন। (মনোবথপূরণি, পৃঃ ২১৮-২১৯; অঙ্গুত্তর-নিকায় পৃঃ ১ম খণ্ড ২৫)

ভদ্দা কুণ্ডলকেসা। ভদ্দা কুণ্ডলকেসা রাজগৃহের কোনও শ্রেষ্ঠীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি এক দিন দেখিতে পাইলেন যে, পুরোহিত পুত্র সখুক নগর-রক্ষকের দ্বারা বধ্যভূমিতে নীত হইতেছে। প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি এই সখুকের প্রেমে পড়িলেন। সখুককে না পাইলে কন্যা মৃত্যুকে ববণ করিবে এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পিতা নগররক্ষককে বহু অর্থ উৎকোচ স্বরূপ প্রদান করিয়া সখুককে মুক্ত করিয়া আনেন। তাহার পর তাহাকে ভদ্দার সমীপে লইয়া যাওয়া হয়। ভদ্দা বহু রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করেন। এই মণিমাণিক্য সমূহ সখুকের মনে আবার লোভের সঞ্চার করায় সে ভদ্দাকে পাহাড়ের দেবতার জন্য একটি পূজার অর্ঘ্য রচনা করিতে বলে। অর্ঘ্য রচনা করিয়া ভদ্দা সমস্ত অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক স্বামীর সহিত দেবার্চ্চনার জন্য পাহাড়ের উপর গমন করিলেন। পর্ব্বত শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া সখুক ভদ্দাকে কহিল,

"তোমার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দাও। কারণ এই অলঙ্কার গুলির জন্যই তোমাকে এখানে আনা হইয়াছে।" ভদ্দা কহিলেন—"এ সমস্ত অলঙ্কারই তোমার, এমন কি আমিও তোমার। সুতরাং এগুলির উপর তোমার লোভের কোনই সার্থকতা নাই।" কিন্তু তাঁহার কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া সে ভদ্দাকে কেবল তাঁহার অলঙ্কার গুলি খুলিয়া দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। ইহার পর সালঙ্করা অবস্থাতেই ভদ্দা তাহাকে আলিঙ্গন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং সত্থুক সে প্রার্থনা পূর্ণ করিল। ভদ্দা প্রথমে তাহাকে সম্মুখ হইতে আলিঙ্গন করিলেন; তাহার পর পশ্চাদ্দেশ হইতে আলিঙ্গন করিবার সময় ধাক্কা দিয়া তাহাকে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ফেলিয়া দিলেন। এইরূপে সত্থুকের মৃত্যু হয় (ধম্মপদত্থকথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭)। অতঃপর ভদ্দা গৃহে না ফিরিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিগন্থদের সম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম আয়ত্ত করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সহিত বিচার করিবার উপযুক্ত কাহাকেও না পাইয়া অবশেষে একটি গ্রাম অথবা সহরের প্রবেশ তোরণের সম্মুখে বালুর ভিতর এক খানি জম্বুবৃক্ষের শাখা প্রোথিত করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন, "যদি কাহারও আমার সহিত বিচারে রত হইবার শক্তি থাকে তিনি যেন এই শাখা পদদলিত করেন।" সারিপুত্ত নিকটস্থ কয়েকটি বালককে এই শাখা পদদলিত করিতে আদেশ দেন, বালকেরা সে আজ্ঞা পালন করিল। এই শাখাকে পদদলিত হইতে

দেখিয়া ভদ্দা কয়েকজন শাক্য সন্ন্যাসীর সমক্ষে সারি-পুত্তকে বিচারে আহ্বান করেন। এই বিচারে ভদ্দা পরাজিত হন। এই সময় সারিপুত্ত ভদ্দাকে বুদ্ধদেবের শরণ লইবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। ভদ্দা ভগবান তথাগতের নিকট গমন করিলে, তিনি তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। ইহার পর ভদ্দা বিশ্লেষাত্মিকা বুদ্ধি সহকারে অর্হত্ত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য. পৃঃ ৯৯ হইতে) উপস্থিত বাক্-চাতুর্য্য-সম্পন্না ভিক্ষুণীদের ভিতর ভদ্দা শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। (মনোরথ-পূরণী, পৃঃ ৩৭৫; অঙ্গুত্তর-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫ তুলনীয়.)

সামা। কোশম্বীর কোনও ধনী গৃহস্থ পরিবারে সামার জন্ম হয়। বুদ্ধের গৃহী শিষ্যা সামাবতীর মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। ইহার পর এক দিন স্থবির-প্রায় আনন্দকে বক্তৃতা করিতে শুনিয়া তাঁহার ভিতর দিব্য-জ্ঞানের উদয় হয়। সপ্তম দিবসে ধর্ম্মের বাহিরের রূপ এবং ভিতরের অর্থ আয়ত্ত করিয়া তিনি অর্হত্ত্ব লাভ করিরাছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৪৪-৪৫)।

আর একজন সামা। আরও এক জন সামা ছিলেন। ইনি কোশম্বীর কোনও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও সামাবতীর সখী ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে এত বেশী অভিভূত হইয়া পড়েন যে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এই মুহ্যমান অবস্থায় ছিলেন. বৃদ্ধ বয়সে একটি উপদেশ শুনিয়া তাঁহার অন্তদৃষ্টি খুলিয়া

যায় এবং পটি-সম্ভিদা-সহ তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৪৫-৪৬)

উব্বিরী। উব্বিরী শ্রাবস্তীর কোনও ধনী গৃহস্থ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কোশলের রাজা তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার এক কন্যা জন্মে কন্যার নাম দেওয়া হয় জীবা। রাজা এই শিশু দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং উব্বিরী:কে রাণীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে জীবা মারা যায়। মাতা শোকবিহ্বল হইয়া সমাধিক্ষেত্রে গমন করিয়া কন্যার জন্য অশ্রুপাত করিতেন। এইভাবে তাঁহাকে এক: দিন রোদন করিতে দেখিয়া ভগবান তথাগত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি রোদন করিতেছ কেন?" উব্বিরী উত্তর দিলেন, "আমার মৃত কন্যাকে স্মরণ করিয়া আমি অশ্রুপাত করিতেছি।" বুদ্ধদেব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"৮৪,০০০ কন্যার ভিতর কাহার নিমিত্ত তুমি রোদন করিতেছ?" একটু চিন্তা করিয়া উব্বিরী বুদ্ধদেবের এই বাণীর মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি উদ্বুদ্ধ হয়। যথাসময়ে নিজের বহু পুণ্য বলে তিনি অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ৫৩-৫৪)

কিসা গোতমী। শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র পরিবারে কিসা গোতমীর জন্ম হয়। একজন ধনী শ্রেষ্ঠী পুত্র তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ৪০ কোটি পরিমিত সম্পদ ছিল। ধম্মপদত্থ-কথা

২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭০-২৭৫) বোধিসত্ত্ব কিসা-গোতমীর মাতুল পুত্র ছিলেন। রাহুলের জন্ম সংবাদ শুনিয়া বোধিসত্ত্ব যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন তখনই তাঁহার প্রাসাদ হইতে কিসা গোতমী বুদ্ধকে দেখিতে পান। বুদ্ধের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। শ্লোকটির অর্থ এই—"যে মাতাব এরূপ সন্তান, যে পিতার এরূপ পুত্র, যে নারীর এরূপ স্বামী তাহারা নিশ্চয়ই নিব্বুত (সুখী)"। কিন্তু বোধিসত্ত্ব নিব্বুত শব্দটি "নিব্বাণ" অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এরূপ একটী শুভ এবং পবিত্র শব্দ শুনাইবার জন্য তিনি তাঁহাকে একটি মুক্তার মালা দান করিয়াছিলেন। (ধম্মপদত্থ-কথা ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫ তুলনীয় অত্থসালিনী পৃঃ ৩৪) কিসাগোতমীর একমাত্র পুত্র যখন মারা যায় তখন সেই মৃতদেহটি লইয়া তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং তাহাতে প্রাণ ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলেন—"তুমি যদি এরূপ গৃহ হইতে একটি সর্ষপ আনিতে পার যে গৃহে কেহ কখনও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, তবে আমি তোমার পুত্রকে প্রাণ দান করিব।" কিসা-গোতমী দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া বুদ্ধদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহারই ফলে তিনি ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি অর্হত্ব অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ১৭৪) যে সব ভিক্ষুণী অমসৃণ ও

সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন তাঁহাদের মধ্যে কিসাগোতমীকে ভগবান বুদ্ধদেব শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছিলেন। (অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫; মনোরথপূরণী পৃঃ ৩৮০ তুলনীয়,)। একদা কিসাগোতমী অন্ধবনে ধ্যান করিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেখানে মার তাঁহার নিকটে আসিয়া বলে—"তুমি তোমার পুত্রদিগকে নিধন করিয়াছ এবং এখানে আসিয়া ক্রন্দন করিতেছ। তুমি আর একজন লোককে খুঁজিয়া গ্রহণ কর না কেন?" মারের কথায় কিসাগোতমী উত্তর দিয়াছিলেন—"আমি আমার পুত্রগণকে এবং স্বামীদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছি এবং এখন আমার আর শোক নাই। আমি তোমাকেও ভয় করি না, আমার আসক্তি ধ্বংস হইয়াছে এবং আমার অজ্ঞানতার অন্ধকারও দূর হইয়াছে। মৃত্যুর সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিয়া আমি নিষ্পাপ হইয়াছি।" ইহার পর মার তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। (সংযুক্ত-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯-১৩০) এক দিন সক্ক যখন তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত বুদ্ধের সম্মুখে বসিয়াছিলেন, তখনই কিসাগোতমী বিমানপথে বুদ্ধদেবের পূজার জন্য আগমন করিতে-ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকটে আগমন না করিয়া শূন্য হইতেই তাঁহাকে পূজা করিয়া তিনি ফিরিয়া যান। সক্ক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধদেব উত্তর দিয়াছিলেন, কিসাগোতমী সেই সব ভিক্ষুণীদের ভিতর শ্রেষ্ঠ যাঁহারা অমসৃণ ও সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে। এই কিসাগোতমী তোমার কন্যা ছিল। (ধম্মপদত্থকথা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৬-১৫৭)

পটাচারা। পটাচারা শ্রাবস্তীর কোনও শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবনে গৃহের একটি ভৃত্যের সহিত তিনি প্রেমে পড়েন এবং সমপদস্থ অন্য একটী যুবকের সহিত বিবাহের নির্দ্ধারিত দিনে প্রণয়ীর সহিত পলায়ন করিয়া একটি কুটীরে বাস করিতে থাকেন। সেখানে তিনি গৃহস্থের সমস্ত কাজ নিজের হাতে সম্পন্ন করিতেন এবং তাঁহার প্রণয়ী অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিত ও অন্যের ক্ষেতে কাজ করিত। ইহার কিছু দিন পরেই পটাচারা একটী সন্তান প্রসব করেন কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সময় প্রবল ঝড় উঠে। তাঁহার স্বামী ঘাস এবং কাঠ কাটিবার জন্য অরণ্যে গমন করিয়াছিল। সেইখানে যখন সে একটি উইয়ের ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া কাঠ কাটিতেছিল তখন উহার ভিতর হইতে একটি সাপ বাহির হইয়া তাঁহাকে দংশন করে। এই সর্পদংশনে সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরের দিন দুই পুত্রসহ পাটাচারা অরণ্যে গমন করিয়া তাঁহার স্বামীকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। অতঃপর রোদন করিতে করিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি পিতৃ-গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে একটি নদী ছিল। হাঁটুজলের বেশী তাহার গভীরতা ছিল না। এই নদী পার হইবার সময় তাঁহার পুত্র দুইটিও ডুবিয়া মারা যায়। শোকে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রাবস্তীতে আসিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে গৃহপতনে তাঁহার পিতামাতা এবং ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পর তিনি পাগল হইয়া যান এবং বস্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন।

এই ব্যাপার হইতেই তাঁহার নাম পটাচারা হয়। এক দিন তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া ভগবান বুদ্ধদেব কহিলেন, "ভগ্নী, তোমার লজ্জাহীনতা হইতে আবার মুক্তিলাভ কর।" এই কথাতেই পটাচোরা জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। অতঃপর ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহাকে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন—"পুত্র, পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন প্রকৃত আশ্রয় নহে। নির্ব্বাণের পথ সত্বর পরিষ্কার করিবার জন্য সত্যকে উপলব্ধি কর।" এই সময়ে পটাচারা সোতাপত্তিফল লাভ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে আরও তাঁহার উপযোগী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি বিশ্লেষাত্মিকা বুদ্ধি-সহ অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য পৃঃ ১০৮ হইতে মনোরথপুরণী, পৃঃ ৩৫৬-৩৬০; অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ড, ২৫ তুলনীয়) অতঃপর তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। বহু শোক-বিহ্বল রমণীকে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। থেরিগাথা-ভাষ্যে দেখা যায়, পটাচারার পাঁচ শত শিষ্যা ছিলেন। তাঁহারা নানা পরিবার ও নানা স্থান হইতে আগমন করেন। ইহাদের সকলেই বিবাহিতা, পুত্রের জননী এবং গৃহাশ্রমে অভ্যস্থা সন্তানের মৃত্যুতে বিহ্বল হইয়া ইঁহারা পটাচারার কাছে উপস্থিত হন। পটাচারা তাহাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দেন যে, জন্ম এবং মৃত্যুর রীতি যখন অপরিজ্ঞাত, তখন শোক করা সঙ্গত নয়। তাঁহার উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসেন। অতঃপর অন্তর্দৃষ্টি অনুশীলন করিয়া পটিসম্ভিদা সহকারে তাঁহারা অর্হত্ত্ব

লাভ করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ১২২-১২৩ হইতে ধম্মপদত্থ কথায় ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬০ তুলনীয়)।

বাসিত্থী। বৈশালীর কোনও সম্ভ্রান্ত বংশে বাসিত্থীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সমপদস্থ এক সম্ভ্রান্ত বংশের পুত্রের সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রটি হাঁটিতে শিখিয়াই মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং শোকে বাশিত্থি পাগলের মত হইয়া যায়। ইহার পর তিনি মিথিলায় গমন করেন এবং সেখানে শান্ত এবং সংযত মূর্ত্তি বুদ্ধ ভগবানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে দেখিয়াই বাসিত্থীর বিকার গ্রস্ত মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্ম্মের গোড়াকার বিষয়গুলি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর সমস্ত কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করিয়া তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানের সাহায্যে সাধনা করিয়া অর্হত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের বাহিরের রূপ এবং ভিতরের অর্থও তাঁহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। (থেরিগাথা-ভাষ্য, পৃঃ ১২৪-১২৫)।

ধম্মদিন্না। রাজগৃহের কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবারে ধম্মদিন্নার জন্ম হয়। বিশাল নামক এক শ্রেষ্ঠির সঙ্গে তিনি বিবাহিত হন। তাঁহার স্বামী একদিন বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করেন। ইহার পরেই ধম্মদিন্নার সঙ্গে তাঁহার বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার দেহও আর তিনি স্পর্শ করেন না। অতঃপর তিনি সংসার পরিত্যাগ করেন। ধম্মদিন্নাও ভিক্ষুণী হইয়া এক

গ্রামে বাস করিতে থাকেন। পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের ফলে চিন্তা, বাক্য এবং কাজের সমস্ত জটিলতাকেই ধম্মদিন্না জয় করিয়াছিলেন। এই প্রতিভার দ্বারা ধর্ম্মের বাহ্যিক অবয়ব এবং ভিতরের অর্থ অবগত হইয়া তিনি অর্হত্ব অর্জ্জন করেন। ইহার পর তিনি যখন রাজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার স্বামী তাঁহাকে খন্ধ এবং অনুরূপ বিষয় সমূহ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রশ্নগুলির এরূপ নির্ভুল উত্তর তিনি প্রদান করিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিয়া বুদ্ধদেব তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করেন। প্রচার-নিরতা ভগ্নীদের ভিতর তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা ভাষ্য, পৃঃ ১৫ হইতে মনোরথপূরণী পৃঃ ৩৬০-৩৬৩ ; অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫)

ধম্মা। শ্রবস্তীর একটি সম্ভ্রান্ত বংশে ধম্মা জন্মগ্রহণ করেন। উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের বাহ্যিক আকৃতি এবং ভিতরের অর্থ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান সহকারে তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য পৃঃ ২৩)।

মেত্তিকা। মেত্তিকা রাজগৃহের একজন ধনী ব্রাহ্মণের কন্যা। তিনি পাহাড়ে আরোহন করিয়া নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টি অর্জ্জন করিয়া অল্প সময়ের ভিতরেই অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য পৃঃ ৩৫)।

অভয়া। উজ্জয়িনীর কোনও সম্ভ্রান্ত বংশে অভয়ার জন্ম হয়। তিনি 'অভয় মাতার সখী ছিলেন।

তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াই অভয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। যথা কালে রাজগৃহে তিনি অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য পৃঃ ৪১-৪৩)

সোমা। সোমা বিম্বিসারের পুরোহিত কন্যা রূপে রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্যা হন। পরে তিনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন করিয়া অল্প সময়ের ভিতরেই অর্হত্ব লাভ করেন। মার তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিল। সংযুক্ত নিকায়ে দেখা যায়, মার তাঁহার কাছে আসিয়া বলিতেছে, "ঋষিরা যাহা লাভ করিবার উপযুক্ত, সামান্য জ্ঞান লইয়া তাহাই অর্জ্জন করিতে তুমি চেষ্টা করিতেছ। মহা জ্ঞানীদের পক্ষেও যাহা অর্জ্জন করা কঠিন নির্ব্বোধ স্ত্রীলোক হইয়াও তুমি তাহাই পাইতে চাও।" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন— "আমার মন যদি দৃঢ় হয় আমি উহা লাভ করিব, আমার নারী স্বভাবও সাফল্যের পথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না।" ইহার পর মার তাঁহাকে ত্যাগ করে। থেরিগাথা-ভাষ্য ৬৬-৬৭; সংযুক্ত নিকায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯ তুলনীয়)।

ভদ্দা কপিলানী। সাগলের কোশিয় সম্প্রদায়ের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ভদ্দা কপিলানীর জন্ম হয়। মহাতিত্থ গ্রামের পিপ্পলি নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবক তাঁহাকে বিবাহ করেন। স্বামী সংসার পরিত্যাগ করিলে তিনি তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পদ আত্মীয়

স্বজনকে বিলাইয়া দেন। তাহার পর সংসার ত্যাগ করিয়া কপিলানী পাঁচবৎসর বিধর্ম্মীদের সঙ্গে বাস করেন। পরে মহাপ্রজাপতী গৌতমী তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি অর্হত্ত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব জন্মের কথা যে সব ভিক্ষুণীর স্মরণ ছিল, ভদ্ধা কপিলানীকেই তাঁহাদের ভিতর প্রথম স্থান দান করিয়াছিলেন। (থেরিগাথা-ভাষ্য পৃঃ ৬৭ হইতে, মনোরথপূরণী পৃঃ ৩৭৫, অঙ্গুত্তরনিকায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫ তুলনীয়)

যে সব রমণী সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী বা থেরী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ছাড়াও আরও অনেক রমনী ছিলেন বুদ্ধের ধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদের বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর ছিল। ইঁহারা সংসার ধর্ম্ম পালন করিয়া জন্মান্তরে সুখের আশায় বা মৃত আত্মীয় স্বজনের পারত্রিক কল্যাণ কামনায় থের, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী-দিগকে অর্থ এবং অন্যান্য জিনিষ দান করিতেন। এইরূপ কতকগুলি নারীচরিত্রের বিবরণ বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাহাদের উল্লেখ সম্ভবতঃ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সুরথের রাজা পিঙ্গলের সেনাপতি নন্দকের কন্যার নাম ছিল উত্তরা। বুদ্ধের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তাঁহার মৃত পিতার কল্যাণের জন্য একজন ঋষির ন্যায় থেরকে সুগন্ধি সুশীতল জল, উৎকৃষ্ট পিষ্টক এবং মিষ্টান্ন দান করিতেন। (পেতবত্থুর টীকা পরমার্থ-দীপনী পৃঃ ২৪৪-২৫৭)

একজন ধর্ম্মশীলা রমণী ভিক্ষু সঙ্ঘের নিমিত্ত এক-

খানি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বুদ্ধদেব এবং ভিক্ষুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া সেই গৃহ খানি তিনি ভিক্ষু সঙ্ঘকে দান করেন। (পেতবথ্থুর টীকা পরমথ্থ-দীপনী, পৃঃ ১৮৬-১৯১)।

শ্রাবস্তীর একটি বালিকার বুদ্ধদেবের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ছিল। এক দিন এক জন ভিক্ষুকে অভ্যর্থনা করিয়া তিনি তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দান করিয়াছিলেন। এই পুণ্য কার্য্যের জন্য তিনি স্বর্ণ বিমানে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। (বিমানবথ্থু-ভাষ্য, পৃঃ ৫-৬)

শ্রাবস্তীব এক জন রমণী গৃহাগত এক জন থেরকে উপবেশনের জন্য নীলবস্ত্রাচ্ছাদিত আসন প্রদান করেন। মৃত্যুর পর তিনি বৈদূর্য্য মণি নির্ম্মিত বিমানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিমানবথ্থু-ভাষ্য, পৃঃ ২৬-২৭)

রাজগৃহের জনৈক রমণী আনন্দ সহকারে এক জন থেরকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে একটি কাষ্ঠের আসন উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। থের আবার এইটি সঙ্ঘকে দান করেন। মৃত্যুর পর এই রমণীটি তাবতিংস স্বর্গেরস্বর্ণ প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিমানবথ্থ-ভাষ্য, পৃঃ ২৭-২৮)

রাজগৃহের কোনও পরিবারের এক কন্যা, রাজা বিম্বিসারকে বহু অনুচর-পরিবৃত হইয়া রাজকীয় জাক-জমকের সঙ্গে বাহির হইতে দেখিয়া, মনে মনে চিন্তা করেন, কোন্ পুণ্যবলে তিনি এই সম্পদ এবং শক্তির অধিকারী হইয়াছেন। - জ্ঞানীদের নিকট হইতে

তিনি জানিতে পারেন যে, কেবল মাত্র দানের প্রভাবেই তাঁহার এই সৌভাগ্য। অতঃপর তিনি সারিপুত্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপবেশনের জন্য তাহাকে কারুকার্য্য খচিত আসন, আহারের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য নূতন বস্ত্র এবং শয্যাও দান করিয়াছিলেন। এই পুণ্য কার্য্যের জন্য তিনি তাবতিংস স্বর্গের স্বর্ণ-প্রাসাদে জন্ম-গ্রহণ করেন। (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ, ৩১ ইত্যাদি)

কোনও একটি স্ত্রীলোক এক জন থেরকে পরিশ্রান্ত এবং পিপাসাতুর দেখিয়া তাঁহাকে গৃহে আহ্বান পূর্ব্বক বসিবার আসন, পা ধুইবার জল এবং পদতলে মর্দ্দনের জন্য তৈল প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি সুস্থ হইলে তাঁহাকে পানের জন্য সুগন্ধ সুশীতল বারি দান করেন। এই পুণ্য কর্ম্মের ফলে তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ৪৪)।

বারাণসীর একটি তোরণ দ্বারের নিকটেই লখুমার বাসস্থান ছিল। সেই দ্বার দিয়া ভিক্ষুরা যখন নগরে প্রবেশ করিতেন তখন সে তাঁহাদিগকে যৎসামান্য অন্ন দান করিত। এইরূপে দানের অভ্যাস তাহার ভিতরে পুষ্টি লাভ করে। 'অসন-সালা'য় ভিক্ষুদিগের বসিবার নিমিত্ত আসন ও জল দান সে করিত অতঃপর সে সোতাপত্তি লাভ করে। মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ৯৭-৯৮)

রাজগৃহের জনৈক উপাসকের কন্যা মহামোগ্‌গল্লানর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। এক দিন সে এই থেরকে

অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দিয়াছিল, সুমন পুষ্পের মাল্যের দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াছিল, এবং তাহাকে ভোজনের জন্য মিষ্টান্ন প্রভৃতি দান করিয়াছিল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ১৭৮-১৭৯)

মল্লিকা শাক্য মহানামনের এক জন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠীব কন্যা। মল্লিকার পিতার মৃত্যুর পর মহানামন তাহাকে নিজগৃহে লইয়া আসেন। প্রথমে তাহার নাম ছিল চন্দা। তাহার রচিত এক গাছি মালা দেখিয়া মহানামন এত আনন্দিত হন যে, তাহার চন্দা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি তাহাকে মল্লিকা নাম দেন। একদা তাহার আহার্য্য লইয়া যখন উদ্যানে গিয়াছিল, তখন সেই পথে ভগবান বুদ্ধদেব ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছিলেন। মল্লিকার মনে তাঁহাকে তাহার খাদ্য দান করিবার বাসনা জাগিয়া উঠে। তাহার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া ভগবান বুদ্ধদেব তাহার সম্মুখে ভিক্ষা পাত্র প্রসারিত করিয়া দেন। মল্লিকা খাদ্য দ্রব্য গুলি সেই পাত্রে রাখিয়া মনে মনে কামনা করে যে, সে যেন এক দিন তাহার দাসত্ব এবং দারিদ্র্য হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এক দিন শীকারের উত্তেজনায় রাজা পসেনদি অশ্ববাহিত হইয়া মহানামনের উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হন। এই খানে মল্লিকার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাজার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া মল্লিকা গাত্র-মার্জ্জনীর দ্বারা তাঁহার পদতল মার্জ্জনা

করিয়া দেয়। ইহার পরেই রাজা ঘুমাইয়া পড়েন। নিদ্রা ভঙ্গে তিনি মল্লিকার পরিচয় জানিতে পারিয়া মহানামনের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অতঃপর মল্লিকা শ্রাবস্তীতে গমন করেন। যথা সময়ে তিনি বিরুঢ়ক নামে একটী পুত্র (Rockhill, Life of Buddha, p.p. 75-77) ও এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন (সংযুক্ত-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬)। এ গল্পটি পসেনদি ও বাসবক্ষত্তিয়া ঘটিত তব্বতীয় গল্পের অনুকরণ মাত্র।

মল্লিকাদেবী বুদ্ধদেবের নিকট গিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স্ত্রীলোকেদের কুৎসিৎ চেহারা কুঅভ্যাস, দুর্দ্দশা এবং দারিদ্র্য হয় কেন? এইরূপ প্রকৃতির নারীরা ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হয় কেন? যে সব রমণী সুন্দরী এবং সুদর্শনা তাহারা দরিদ্র এবং প্রতিপত্তিহীনা হয়ই বা কেন? কিংবা ইহার বিপরীত ঘটনাই বা কেন ঘটে?" বুদ্ধদেব উত্তরে বলিয়াছিলেন—"যে নারী কোপন-স্বভাব, যে সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, সে যদি শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণদিগকে দান না করে তবে সে দরিদ্র ও কুৎসিৎ হয়। কিন্তু সে যদি ব্রাহ্মণ বা শ্রমণকে দান করে তবে উগ্র প্রকৃতি সত্বেও সে ধনবতী ও প্রতিপত্তি-শালিনী হয়।" বুদ্ধদেব আরও বলেন যে, "যে নারী উগ্র প্রকৃতি নয়, অল্প কারণে যে রুষ্ট হয় না, সেও যদি শ্রমণ অথবা ব্রাহ্মণদিগকে দান না করে তাহা হইলেও সে দরিদ্র ও প্রতিপত্তিহীনা হয়।" অতঃপর মল্লিকা স্বীকার করেন যে, উগ্র-স্বভাবের জন্য তিনি কুৎসিত

চেহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পূর্ব্বের দানের জন্য রাণীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, যে সব ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য গৃহস্থদের কন্যা তাঁহার অধীনে বাস করে তিনি তাহাদের প্রতি যথোচিত সদয় ব্যবহার করিবেন। বুদ্ধদেবের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২ ২০৫)

মল্লিকার সম্বন্ধে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। এক দিন পসেনদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"তাঁহার নিজের আত্মা অপেক্ষা আর কেহ তাঁহার অধিকতর প্রিয় আছে কি না ?" মল্লিকা উত্তর দিয়াছিলেন,—"না তাঁহার নিজের আত্মার অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বস্তু তাঁহার আর কিছুই নাই।" এই প্রশ্নটি অতঃপর তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। পসেনদিও রাণীর উত্তরের অনুরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর পসেনদি ব্যাপারটি ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট বিবৃত করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"নিজের আত্মার অপেক্ষা কোনও বস্তুই যে অধিকতর প্রিয় নহে, এ বিশ্বাস পোষণ করিয়া তাহারা সত্যকেই আশ্রয় করিয়াছেন।" উদান, পৃঃ ৪৭, সংযুক্ত-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫ তুলনীয়)

রাণী মল্লিকা এবং বাসবক্ষত্রিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, পসেনদি তাঁহাদিগকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি আনন্দকে নিযুক্ত করিতে

উপদেশ দেন, কারণ তাঁহার পক্ষে প্রত্যহ শিক্ষাদানের নিমিত্ত গমন করা সম্ভবপর নয়। মল্লিকা ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাসব-ক্ষত্তিয়ার শিক্ষার প্রতি তত মনোযোগ ছিল না। (ধম্মপদত্থ-কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮২) রাত্রি দ্বিপ্রহরে রাজা পসেনদি চারিটি ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিতেন। এই শব্দ শ্রবণের কুফল হইতে রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য মল্লিকা তাঁহাকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করেন। ফলে ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত যে সকল প্রাণী বলির জন্য আনীত হইয়াছিল, তাহাদের প্রাণ মল্লিকার দ্বারা রক্ষা হয় (ধম্মপদত্থ-কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭-৮)। নিজের একটি অন্যায় স্বামীর নিকট হইতে গোপন করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলায় মৃত্যুর পর মল্লিকাকে অভীচি নরকে বাস করিতে হইয়াছিল। (ধম্মপদত্থ কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৯ হইতে)

পসেনদি বুদ্ধদেব এবং ভিক্ষুদিগকে একবার বিরাট্ উপহার দান করেন। এই ব্যপারে মল্লিকা দেবী নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থা গুলি করিয়াছিলেনঃ—(১) তিনি শাল কাষ্ঠের সাহায্যে একটি মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই মণ্ডপের ভিতরে ৫০০ এবং বাহিরে ৫০০ ভিক্ষুর বসিবার স্থান ছিল। (২) ৫০০ হস্তী ৫০০ ভিক্ষুর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ৫০০ শ্বেত ছত্র উত্তোলন করিয়াছিল। (৩) মণ্ডপের মধ্যস্থলে স্বর্ণতরি সমূহ স্থাপিত করা হইয়াছিল। দুই জন ভিক্ষুকের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক জন করিয়া ক্ষত্রিয় কন্যা গন্ধ দ্রব্য সমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

(৪) দুই জন ভিক্ষুর মধ্যস্থলে এক জন করিয়া ক্ষত্রিয় কুমারীকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। (৫) স্বর্ণতরি সমূহ নানা প্রকার গন্ধদ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল।

রাণী মল্লিকার কন্যার নামও ছিল মল্লিকা। সেনাপতি বন্ধুল তাঁহাকে বিবাহ করেন। দীর্ঘকাল তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এই জন্য বন্ধুল তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে প্রেরণ করেন। পথে তিনি বুদ্ধদেবকে প্রণাম করিবার জন্য জেতবনে গিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে নিঃসন্তান বলিয়া যে পিত্রালয়ে প্রেরণ করা হইতেছে এ কথা বুদ্ধদেবের কর্ণ গোচর হয়। তিনি তাঁহাকে স্বামীগৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করেন। বন্ধুল এ কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পত্নীর গর্ভ-সঞ্চারের সম্ভাবনা দেখিয়াই বুদ্ধ হয় তো তাহাকে ফিরিয়া আসিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। সত্য সত্যই তাঁহার গর্ভের লক্ষণও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই সময় লিচ্ছবিদের সুরক্ষিত জলাশয়ের জলপান এবং তাহাতে স্নান করিবার বাসনা মল্লিকার মনের মধ্যে উদয় হয়। বন্ধুল এই জলাশয় আক্রমণ করিয়া তাঁহার পত্নীর অভি-প্রায় পূর্ণ করিয়াছিলেন (ধম্মপদত্থ-কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৯-৩৫১)। বন্ধুলের পত্নী মল্লিকা এবং কুশিনারার জনৈক মল্লরাজ-কন্যা প্রচুর গন্ধ, মাল্য এবং বহুমূল্য অলঙ্কার মহালতার দ্বারা বুদ্ধদেবের স্মৃতি চিহ্নের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি কেবল

মাত্র পীত পরিচ্ছেদেই দেহ আবৃত করিতেন (বিমানবত্থু-ভাষ্য, পৃঃ ১৬৫)।

বজ্জিরা এক জন ভিক্ষুণী ছিলেন। তিনি যখন অন্ধবনে তপস্যার জন্য গমন করেন, তখন মার তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে। মার তাহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে—"এই জীব জগৎ কে সৃষ্টি করিয়াছে? ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায় গমন করিবে?" ভজিরা উত্তর দিয়াছিলেন, —"পঞ্চখন্ধের সমষ্টির দ্বারা সত্য সঙ্ঘটিত।" উত্তর শুনিয়া মার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, (সংযুক্ত-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪-১৩৫)।

বুদ্ধদেবে জনৈক উপাসক চীরা ভিক্ষুণীকে একটি পরিচ্ছদ দান করিয়াছিলেন। এ সংবাদ রাজগৃহের রাস্তায় রাস্তায় প্রচার করিয়া এক জন যক্ষ বলিয়াছিলেন—চীরা সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত। সুতরাং তাঁহাকে পরিচ্ছদ দান করিয়া দাতা যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন (সংযুক্ত-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩)।

বহু ভিক্ষুণী মহাকাস্সপের নিকট গমন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই ভিক্ষুণীদের ভিতরেই এক জনের নাম ছিল থুল্লতিস্সা। সে আনন্দের সাক্ষাতেই মহাকাস্সপের শিক্ষার নিন্দা করে। সকল কথা শুনিয়া আনন্দ বলিয়াছিলেন—মহাকাস্সপের জ্ঞানের গভীরতা বোঝা শক্তির অতীত। অর্হৎদিগের নিন্দা করায় থুল্লতিস্সাকে সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল (সংযুক্ত-নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৫ হইতে)।

উত্তরা এবং তাহার স্বামী রাজগৃহের এক জন শ্রেষ্ঠী গৃহে চাকরী করিত। একদা উত্তরা এবং তাহার স্বামীকে গৃহে রাখিয়া শ্রেষ্ঠী কোনও বিখ্যাত উৎসবে যোগদান করিতে গমন করেন। প্রভাতে মাঠে চাষের জন্য চলিয়া যাওয়ায় উত্তরা তাহার স্বামীর জন্য অন্ন লইয়া যখন মাঠে গমন করিতেছিল, তখনই সারি-পুত্তের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সারিপুত্ত কেবল মাত্র তখনই নিরোধসমাপত্তি হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। উত্তরা খাদ্য দ্রব্যগুলি এই সারিপুত্তকেই দান করে। ফলে উত্তরা রাজগৃহের সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালিনী মহিলা হইয়াছিলেন এবং তাহার স্বামী মহাজন শ্রেষ্ঠী নাম ও নগর-শেখির পদ লাভ করিয়াছিলেন (ধম্মপদত্থ-কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০২ হইতে)।

শ্রাবস্তীর এক জন মহাজনের দাসীর নাম ছিল **পুন্না**। একদা তাহার উপরে প্রচুর পরিমাণে ধান ভানিবার আদেশ পড়ে। ভিক্ষুরা সে দিন রাত্রিতে শ্রেষ্ঠীর গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিবার ভার মল্ল দব্বার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ধান ভানিয়া পুন্না যখন বিশ্রামের জন্য গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল আলো হস্তে লোক-জন তখনও ঘোরা-ফেরা করিতে ছিল দেখিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পুন্না ভিক্ষুদের আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিল। বাহিরে আসিবার সময় নিজের আহারের জন্য সে কয়েক খানি পিষ্টক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। পুন্না যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল ভগবান বুদ্ধদেব সেই স্থান দিয়া ভিক্ষার্থে গমন করিতে-

ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নিজের জন্য কিছু না রাখিয়াই পুণ্ণা সবগুলি পিষ্টক তাঁহাকে দান করে এবং তিনি সেগুলি গ্রহণ করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব সে পিষ্টক গুলি ভোজন করিবেন কি না সে বিষয়ে পুণ্ণার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় বুদ্ধদেব তাহার গৃহে গিয়াই পিষ্টক গুলি ভোজন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে পুণ্ণা যে স্থানে পিষ্টক গুলি দান করিয়াছিল সেই স্থানেই সে সোতাপত্তি-ফল লাভ করিয়াছিল (ধম্মপদত্থ-কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২১ হইতে)।

রোহিণী অনুরুদ্ধের ভগিনী। তিনি শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হন। এই রোগের জন্য তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহিলেও তিনি ভ্রাতার নিকট গমন করা বন্ধ করিয়াছিলেন। অনুরুদ্ধ পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাঁহাকে ভিক্ষুদের নিমিত্ত একটি বিশ্রাম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবার উপদেশ দেন। এই বিশ্রাম গৃহটী যখন নির্ম্মিত হইতেছিল তখনও রোহিণী ইহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। এই পরিষ্কারের কার্য্যে তাঁহার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইত এবং সমস্ত কার্য্যই তিনি গভীর অনুরাগের সহিত স্বয়ং সম্পন্ন করিতেন। ইহার পর রোহিণী রোগমুক্ত হন। কিছুকাল পরে বুদ্ধদেব যখন কপিলাবস্তুতে গমন করেন তখন তিনি রোহিণীকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "পূর্ব্বজন্মে তুমি বারাণসীর রাজার রাণী ছিলে। রাজা এক জন নর্ত্তকীর রূপে মুগ্ধ হন। তুমি এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া হিংসায় নর্ত্তকীর বস্ত্রে এবং

স্নানের জলে এরূপ একটি জিনিষ মিশাইয়া দিয়াছিলে যাহার ফলে স্নানান্তে নর্ত্তকীর সমস্ত দেহে ক্ষত উৎপন্ন হয়। সেই পাপের ফলেই তোমাব দেহে এই ব্যাধির সৃষ্টি।” রোগিণী সোতাপত্তিফল লাভ কবিয়াছিলেন এবং তাঁহার দেহের বর্ণ সোনাব ন্যায় হইয়াছিল। (ধম্মপদত্থ-কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৫ হইতে)

এক জন কৃষকের কন্যা ধান্য ক্ষেত্রের রক্ষাণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকা কালে মাঠেই খই প্রস্তুত করিতেছিল। সে সময় মহাকাস্‌সপ পিপ্পলি গুহায় এক সপ্তাহের জন্য ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। ধ্যান ভাঙ্গিবার পর তিনি বালিকাটীর নিকট ভিক্ষা চাহিতে যান। বালিকাটী সানন্দে তাহাকে কতকগুলি লাজ উপহাব দেয়। উপহার দান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় পথে বিষাক্ত সর্প দংশনে তাহার প্রাণত্যাগ হয়। মৃত্যুর পর এই পুণ্য কর্ম্মের জন্য তাবতিংস স্বর্গের একটী প্রাসাদে আবার তাহার জন্ম হয় এবং সেখানে তাহার নাম হয় **লাজদেবাধিতা**। এই মেয়েটী অধিকতর পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য মহাকাস্‌সপের সেবার নিমিত্ত স্বর্গ হইতে আগমন করিয়া তাঁহার কুটীর পরিষ্কার করিত এবং ব্যবহারের জন্য জল ধরিয়া রাখিত। দুই দিন এইরূপ সেবা করিবার পর তাহাকে দেবী জানিতে পারিয়া তাহাকে সেবার কাজ করিতে নিষেধ করা হয়। এইরূপে সেবা করিতে না পাইয়া লাজদেবাধিতা বিশেষ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া বুদ্ধদেব তাঁহাকে একটি উপদেশ প্রদান করেন।

ফলে লাজদেবাধিতা সোতাপত্তিফললাভ করিয়াছিলেন (ধম্মপদত্থ-কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬-৯)।

কুমার কাস্‌সপের মাতা সংসার আশ্রম ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই গর্ভবতী হন কিন্তু তিনি যে অন্তঃস্বত্তা হইয়াছেন তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, ভিক্ষুণী হইবার পর তিনি জানিতে পারেন। ব্যাপারটি বুদ্ধদেবের গোচরে আনা হয়। তিনি উপালির উপর এ বিষয়ের অনুসন্ধানের ভাব দেন। উপালি আবার পসেনদি, অনাথ পিণ্ডক এবং বিসাখাকে ভার দেন। অতঃপর ব্যাপারটীর মীমাংসার ভার সম্পূর্ণ রূপেই বিসাখার উপর অর্পিত হয়। বিসাখা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি সত্য সত্যই সংসার ত্যাগের পূর্ব্বেই গর্ভিণী হইয়াছিলেন এবং সেই ভাবেই ব্যাপারটির মীমাংসা করেন (ধম্মপদত্থ-কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৪ হইতে)।

সুপ্পবাসা কোলিয়ধিতা সাত বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভবতী ছিলেন—কিন্তু সন্তান প্রসব করেন না। সাত বৎসর পরে তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়, এবং সাত দিন পর্য্যন্ত তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন; তথাপি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না। অবশেষে তিনি তাঁহার স্বামীকে বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিতে অনুরোধ করেন। স্বামী তদনুসারে বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা জানান। অতঃপর বুদ্ধদেব বিনা বেদনায় এবং বিনা ব্যাধিতে সুপ্পবাসার সন্তান প্রসবের কামনা করেন। এই কামনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার এক সন্তান

ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার পর নিমন্ত্রণ করিয়া বুদ্ধদেবকে গৃহে আনিবার জন্য সুপ্পবাসা তাঁহার কাছে আবার স্বামীকে পাঠান। বুদ্ধদেব তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার গৃহে সাত দিন ভোজন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন (উদান, পৃঃ ১৫·১৭; ধম্মপদত্থ-কথা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯২-১৯৩ তুলনীয়)। সুপ্পবাসা প্রত্যহ পাঁচ শত ভিক্ষুকে ভিক্ষা দান করিতেন (ধম্মপদত্থ-কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯)। যে সকল উপাসিকা বুদ্ধদেবকে খাদ্য-দ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন সুপ্পবাসা তাহাদের অগ্রণী ছিলেন। এই খাদ্যদ্রব্য দান করিলে যে পুণ্য লাভ করা যায় বুদ্ধদেব তাহা তাঁহার কাছে বর্ণনা করেন এবং আরও বলেন যে, "অন্নদানের দ্বারা দাতা গ্রহীতার জীবন, সৌন্দর্য্য, সুখ এবং শক্তির পরিমাণই বাড়াইয়া দেন এবং ইহার বিনিময়ে দাতা নিজে লাভ করেন—স্বর্গীয় জীবন, ও সৌন্দর্য্য, আনন্দ ও সামর্থ্য (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬২-৬৩)

জটিলাগাহিয়া নাম্নী এক জন ভিক্ষুণী সাকেত সহরে আনন্দের নিকট গিয়া সেই সমাধির বিষয় জানিতে চান যাহার ফলে মন দৃঢ় ও অবিচল হয়। আনন্দ উত্তরে বলিয়াছিলেন—"এরূপ সমাধির দ্বারা অর্হত্ত্ব লাভ করা যায়।" (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২৭-৪২৮)

নকুল-মাতা নামে এক জন খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্পন্না ভিক্ষুণী ছিলেন। তাঁহার পীড়িত স্বামী ও পুত্র-

পরিবারের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন, কারণ তাঁহার পত্নী সূতা কাটিতে জানিতেন, বস্ত্র বুনিতে পারিতেন। সংসারের বিধি-ব্যবস্থা এবং সন্তান-সন্ততির ভরণ পোষণেও তিনি সমর্থ ছিলেন। নকুল-মাতা তাহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন যে—তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি আর বিবাহও করিবেন না, কারণ ১৬ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা উভয়ে আসঙ্গ-লিপ্সা ত্যাগ করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রবেশ করিবেন। তিনি স্বামীর নিকট ধর্ম্মের অনুশাসনগুলি পালনের প্রতিশ্রুতিও দান করেন এবং বলেন যে, তিনি সেই সব উপাসিকাদেরই এক জন যাঁহারা সম্পূর্ণ ভাবে অনুশাসনগুলি মানিয়া চলেন, যাঁহারা মনকে সম্পূর্ণ ভাবে সংযত করিয়াছেন, বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের প্রতি যাঁহাদের গভীর বিশ্বাস আছে, যাঁহারা নির্ভীক এবং যাঁহারা বুদ্ধদেব ছাড়া আর কাহারও শরণ লন না। (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৫ হইতে)।

বোজ্ঝা একজন বুদ্ধের উপাসিকা। তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে শীল এবং উপোসথ পালনের পুরস্কার সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"ষোলটি রাজ্যর অধি-পতি হইয়া যে আনন্দ লাভ করা যায় উপোসথ পালনের দ্বারা তাহা অপেক্ষা ষোলগুণ অধিক আনন্দ পাওয়া যায় (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫৯-২৬০)।

বেলুকণ্টকী নন্দমাতা বুদ্ধের আর এক জন উপাসিকা। তিনি সারিপুত্ত এবং মোগ্‌গল্লানকে উপহার

দান করিয়াছিলেন। এই দানের উল্লেখ করিয়া বুদ্ধদেব বলেন—"দানের পূর্ব্বে, দান করিবার সময়, এবং দানের পরেও দাতার মনে সন্তোষ থাকা চাই। যিনি দান গ্রহণ করিবেন তাঁহার মনও রাগ, দ্বেষ এবং মোহ হইতে মুক্ত থাকা চাই। এইরূপ দানের ফল অপরিমেয়।" সারিপুত্ত এবং মহামোগ্গল্লানকে নন্দমাতা এইরূপ দান করিয়াছিলেন এবং দানের উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছিলেন (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬-৩৩৭)।

নন্দমাতা নামে আর এক জন ভিক্ষুণী ছিলেন। একসময়ে সুমিষ্ট সুরে তিনি যখন সুত্ত নিপাতের পারায়ণ সুত্ত আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন রাজা বেস্‌স-বন উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করিতেছিলেন। আবৃত্তি শুনিয়া তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সেইখানে অপেক্ষা করেন এবং তাঁহার আবৃত্তির অজস্র প্রশংসা করেন। উত্তরে নন্দমাতা বেস্‌সবনকে বলেন—"এ কার্য্যের দ্বারা যে পুণ্য লাভ হইবে তাহাতে আপনারই কল্যাণ হউক।" রাজা আনন্দের সহিত এই দান গ্রহণ করিয়া বলেন, "সারিপুত্ত এবং মোগ্‌গল্লানকে দান করিয়া আপনি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাতে আমারই কল্যাণ সাধিত হইবে" (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৩ হইতে)।

মিগসালা বুদ্ধদেবের এক জন উপাসিকা। তিনি আনন্দের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন "বুদ্ধদেব উপদেশ অনুসারে এক জন ব্রহ্মচারী এবং এক জন অ-ব্রহ্মচারী, মৃত্যুর পর একইস্থানে গমন করে এবং সমভাবেই আনন্দ

উপভোগ করে।” আনন্দ এই সমস্যার সমাধানের জন্য বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বলেন, “এই উপাসিকাটি জ্ঞানহীনা এবং অশিক্ষিতা। তাই সে উপদেশের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারে নাই।” তিনি আরও বলেন, “ব্রহ্মচারী যদি তাহার কর্ত্তব্য যথাযথ ভাবে পালন না করে তবে এক জন গৃহস্থের পক্ষেও তাহার অনুরূপ পুণ্য অর্জ্জন করা অসম্ভব নহে।” (অঙ্গুত্তর-নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৭ হইতে)।

দিন্না নামে এক জন ভিক্ষুণী ছিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সক্কায়দিখি, সক্কায়নিরোধ, অরিয়ট্‌ঠঙ্গিক মগ্‌গো, সংখার, নিরোধ-সমাপত্তি, নিরোধ-সমাপত্তি হইতে উত্থান-পদ্ধতি এবং বেদনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। ধর্ম্মদিন্না সমস্ত প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর দান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, “সক্কায় পঞ্চ উপাদান খন্ধর দ্বারা গঠিত। তনহার অর্থ সক্কায় সমুদয়ো। তনহার ধ্বংসের অর্থ সক্কায়-নিরোধ। আট প্রকারের মহাপথের অনুসরণ দ্বারাই সক্কায়-নিরোধ লাভ করা যায়। অজ্ঞানী লোকেরাই পঞ্চ উপাদান খন্ধকে একত্রে এবং আত্তাকে (আত্মাকে) পৃথক ভাবে গ্রহণ করে, সাধু শিষ্যেরা সে ভাবে গ্রহণ করে না। যাঁহারা নিরোধ-সমাপত্তি প্রাপ্ত হন তাঁহারা এগুলি একটির পর একটি বন্ধ করেন। তিন প্রকারের বেদনার নাম সুখ, দুঃখ, এবং অদুখ-অসুখ (মজ্ঝিম-নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯ হইতে)।

সুজাতা নামে এক জন উপাসিকা ছিলেন। তিনি তিন প্রকারের সমযোজনকে ধ্বংস করিয়া

সোতাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। (সংযুক্ত-নিকায়, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬)।

ভিক্ষুণী **নন্দা** কোশলরাজের ভগিনী। এক রাত্রিতে আকাশপথে গমন কালে অসৎ ভিক্ষু-দিগকে বিতাড়িত করিয়া এবং সৎ ভিক্ষু-দিগকে রক্ষা করিয়া তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ পবিত্র রাখিবার নিমিত্ত কালাশোক ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (সাসনবংস, পৃঃ ৬)।

সামাবতী কোশম্বীর রাজা উদয়নের পত্নী। উদয়ন যখন রাজোদ্যানে ছিলেন তখন রাজান্তঃপুরে আগুন লাগিয়া সামাবতী তাঁহার পরিচারিকা-সহ দগ্ধ হন। বুদ্ধদেব এই ঘটনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'প্রত্যেক উপাসিকা তাহার কর্ম্মফল লাভ করিয়াছে। কেহ সোতাপন্না, কেহ সকদাগামী, কেহ অনাগামী প্রভৃতি হইয়াছে। (উদান, পৃঃ ৭৯)।

লিলাবতী লঙ্কার রাজা পরাক্রমবাহুর প্রধানা মহিষী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ তীক্ষ্ণ ধী শক্তি ছিল। সিংহলের পাণ্ডুরাজবংশে তাঁহার জন্ম হয় (ডাঠাবংশ)। অসোক ব্রাহ্মান প্রত্যহ আট জন ভিক্ষুর উপযুক্ত খাদ্য সঙ্ঘে সরবরাহ করিবার ভার বীরণী নামে এক জন পরিচারিকার উপর অর্পণ করেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত এই কাজ সম্পন্ন করায় মৃত্যুর পর বীরণী একটী বিমানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (মহাবংস, পৃঃ ২১৫)।

রূপনন্দা বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভগিনী। তিনি এক-সময়ে ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসার

পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দ ভিক্ষু হইয়াছে, রাহুলকুমার ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছেন, তাহার স্বামীও এক জন ভিক্ষু, এবং তাঁহার মাতা মহাপজাপতী গোতমীও এক জন ভিক্ষুণী। এত গুলি আত্মীয়কে সংসার পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তিনিও সংসার পরিত্যাগ করেন। তিনি অত্যন্ত রূপ-গর্ব্বে গর্ব্বিতা ছিলেন। বুদ্ধদেব রূপের নশ্বরত্ব এবং অপদার্থতা প্রচার করিতেন বলিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন না; কিন্তু অন্যান্য ভিক্ষুণীরা তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বদা বুদ্ধদেবের প্রশংসা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, যাঁহার রুচি যেরূপই হউক না কেন, বুদ্ধ-দেবকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হন। (ধম্মপদত্থ কথা-৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৫)।

নন্দা শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামের নন্দসেন নামক এক জন গৃহস্থের পত্নী। বুদ্ধের প্রতি তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। সে অত্যন্ত উগ্রস্বভাবের রমণী ছিল এবং স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ীর নিন্দা করিত। ফলে মৃত্যুর পর সে প্রেতিনীরূপে জন্মগ্রহণ করে। এক দিন সে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার অতীত জীবনের দুষ্কর্ম্ম সমূহ উল্লেখ করায় তিনি তাহার জন্য ভিক্ষুদিগকে দান করেন। এইরূপে নন্দা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পায়। (P. D. on the Petavatthu, pp. 89-92)

ইহার পর নন্দা অন্যান্য ভিক্ষুণীদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের নিকটে গমন করে—কিন্তু বুদ্ধদেবের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হন না। অন্যান্য ভিক্ষুণীর সহিত নন্দাও

আগমন করিয়াছে জানিতে পারিয়া, তাহার রূপগর্ব্ব ধ্বংস করিবার জন্য বুদ্ধদেব কৃত-সঙ্কল্প হন। এই নিমিত্ত দৈবশক্তিপ্রভাবে তিনি একটী অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই রমণীটী বুদ্ধদেবকে ব্যজন করিতেছিল। ইহাকে দেখিয়া নন্দা বুঝিতে পারিল তাহার রূপ কত অকিঞ্চিৎকর। ধীরে ধীরে রমণীটির দেহে প্রথম যৌবনের লাবণ্য বিকশিত হইয়া উঠিল, তাহার পর তাহার গর্ভসঞ্চারের অবস্থা দেখা দিল, তাহার পর বার্দ্ধক্য আসিল, তাহার পর রোগ এবং সর্ব্বশেষে মৃত্যু আসিয়া সব শেষ করিয়া দিল। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নন্দার মন হইতে রূপের মোহ দূর হয় এবং সে সৌন্দর্য্যেব ক্ষণস্থায়িত্ব উপলব্ধি কহিতে সমর্থ হয়। তাহার মনের এই পরিবর্ত্তনের কথা জানিতে পারিয়া বুদ্ধদেব তাহাকে একটি উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশ শ্রবণের ফলে সে অর্হত্ব লাভ করে। (ধম্ম-পদত্থ-কথা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩ হইতে)।

বারাণসীর এক গৃহস্থের কন্যার নাম ছিল রেবতী। বুদ্ধের প্রতি তাহার কোনওরূপ অনুরাগ ছিল না এবং সে অত্যন্ত অনুদার প্রকৃতির রমণী ছিল। প্রতিবেশী-পুত্র নন্দিয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার জন্য তাহার পিতামাতা তাহাকে কিছুদিনের জন্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করান। বিবাহের পরেও নন্দিয় তাঁহার পুণ্যকর্ম্মে রেবতীকে যোগদান করিতে বাধ্য করেন। ইহার পর একবার নন্দিয়কে কার্য্য উপলক্ষেও দূরদেশে গমন করিতে হয়। যাইবার সময় তিনি তাহার অনুষ্ঠিত

কর্ম্ম-সমূহ পালনের জন্য রেবতীকে উপদেশ দিয়া যান। রেবতী সাত দিন পর্য্যন্ত এ উপদেশ পালন করে। তাহার পরেই সমস্ত বন্ধ করিয়া দেয় এবং ভিক্ষুরা তাহার দ্বারে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইলে তাহা-দিগকে অপমান করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। নন্দিয়ই ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পান যে তাঁহার সমস্ত পুণ্য কর্ম্মই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পর রেবতী প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নন্দিয় দেবজন্ম লাভ করেন। দেবতার দিব্যদৃষ্টিতে রেবতীর দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া তিনি বলেন—"আমি যে পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি তাহা তুমি অনুমোদন করিলে এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্তি লাভ করিবে।" রেবতী তাহা অনুমোদন করিবা মাত্র সে দেবদেহ পরিগ্রহ করে। অতঃপর নন্দিয়ের সঙ্গে রেবতী স্বর্গে বাস করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। (বিমানবত্থু-ভাষ্য এবং সুত্তসঙ্গহ)

নির্ঘণ্ট